সেবা প্রকাশনা
সেবা রোমান্টিক
আমরা দুজনে
খন্দকার মজহারুল করিম

প্রেম ও রহস্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট
'সেবা রোমান্টিক' সিরিজের পঞ্চম উপন্যাস

আমরা দুজনে

খন্দকার মজহারুল করিম

ভালবাসার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারল না
বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্পদশালিনী তরুণী—
আইরিন চৌধুরী।
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে তার পরিচয় হল
আরিফ ইফতিখারের সঙ্গে। অজানা দ্বীপের অজ্ঞাত পরিচয়
এই লোকটিকে বোকার মত ভালবেসে ফেলে
সে টের পেল, জড়িয়ে পড়েছে এক রোমহর্ষক ঘটনার জালে।
রাতের অন্ধকারে ট্রেনের কামরায় খুন হল নিরীহ দম্পতি।
ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসম সাহস আর মহান হৃদয়ের অধিকারী
এই আরিফ আসলে কে?

আঠারো টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

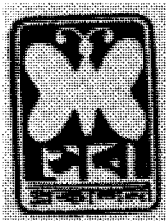

সেবা প্রকাশনীর নতুন সিরিজ

প্রেম ও রহস্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট

'সেবা রোমান্টিক'-এর আরও ক'টি বই:

খন্দকার মজহারুল করিম:

সেই চোখ

তোমার জন্যে

জানিনা কখন

রোকসানা নাজনীন:

বন্দী অপ্সরা

ফিরিয়ে দাও (প্রকাশিতব্য)

সেবা রোমান্টিক
সিরিজের
পঞ্চম বই

আমরা দুজনে

প্রেম ও রহস্য—এই দুইয়ের মিলনে
রোমান্টিক উপন্যাস

খন্দকার মজহারুল করিম

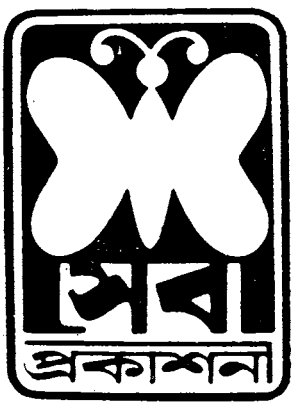

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AMRA DUJONEY
by Khandakar Mazharul Karim

আমরা দুজনে

খন্দকার মজহারুল করিম

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ-পড়ে কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজি-স্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক

এক

'এসব কি বলছ তুমি ?'

শাহ আলমের স্বর বিকৃত শোনাল।

আইরিন জানালার কাছে ঘুরে দাঁড়ায়।

'আমি দুঃখিত, আলম,' বলল সে, 'ভয়ানক দুঃখিত।'

'দুঃখিত মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?'

'আমি অনেক চেষ্টা করেছি। যুদ্ধ করেছি মনের সঙ্গে। পারলাম না। তোমার সঙ্গে মিছেমিছি অভিনয় করতে পারব না আমি। ভালবাসা নিয়ে খেলা করা যায় না।'

'এত অল্প সময়ে কি করে বুঝলে, আমাকে ভালবাসতে পারবে না তুমি ?' শাহ আলম বাধা দিয়ে বললো, 'আমরা তো মেলামেশার তেমন একটা সুযোগই পাইনি। এস, একসঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাই। কোথাও বেড়িয়ে আসি, চল। শুধু তুমি আর আমি।'

আইরিন জানালার কাছে ফিরে গেল।

'কোন লাভ নেই,' বলল সে, 'অনেক ভেবে দেখেছি, আমরা

একে অন্যের উপযুক্ত নই।'

শাহ আলম সিগারেট ধরাল। সশব্দে লাইটার রাখলো টেবিলের ওপর। রেগে গেছে।

আইরিন তার দিকে তাকাল। শান্ত চোখ। সে বুঝতে পারল, শাহ আলমের অহংসমুদ্রের কোথায় ঢিল ছুঁড়েছে সে। কোন নারী কখনও শাহ আলমকে ফেরায়নি। তার অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা। এ-দু'টো জিনিস থাকলেই তো যা চাইবার সবই পাওয়া যায়। আইরিন দেখতে পেল, তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। সে-ও মন শক্ত করল আরও। অহংসর্বস্ব একটা লোককে ভালবাসা যায় না।

আর কোন দোষ অবশ্য শাহ আলমের নেই। প্রতিষ্ঠার উঁচু শিখরে তার অবস্থান। মন্ত্রীদের একান্ত কক্ষে তার অবাধ যাতায়াত। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। তার প্রণয়-প্রার্থনা কিংবা পরিণয়-প্রার্থনা কোনটিরই জবাবে 'না' বলা যায় না। প্রথম পরিচয়ে তো আইরিন রীতিমত সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল।

'অন্য কেউ আছে নাকি পেছনে?' শাহ আলমের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন শুনতে পেল সে।

'না, থাকলে, নিশ্চয়ই বলতাম।'

'তাহলে বাধা কোথায়?'

জানালার পর্দা টেনে দিয়ে আইরিন ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এল। মার্বেল পাথরের টেবিলের পাশে দাঁড়ান শাহ আলমের মুখোমুখি হল সে।

'বাধা আমার হৃদয়ে। কোনভাবেই তোমার জায়গা করতে পারছি না সেখানে। নিজেও জানতাম না, আলম, আমার

হৃদয় এত জটিল!'

'হৃদয়!' চাপা গর্জন করল শাহ আলম, 'তোমার হৃদয়ের চাওয়া খুব বেশি। আমি তোমায় ভালবাসি, আইরিন, বিয়ে হয়ে গেলে তোমার হৃদয় পূর্ণ করে ভালবাসতে শেখাতে পারতাম। ইচ্ছে ছিল, তুমি রাজি হলে বিয়ের পর হাইতি কিংবা মায়ামিতে হানিমুনে যাব।'

'আমাকে ক্ষমা কর, আলম, প্লিজ—!'

আইরিনের কাঁধে হাত রাখল শাহ আলম। 'আমার কথা শোন, আইরিন। আমার পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কোন নারী নেই। একবার রাজি হও, বিয়েটা হয়ে যাক। দেখবে, তুমিও ভালবেসে ফেলেছ আমাকে। আমি তোমাকে তৈরি করে নেব।'

আস্তে করে কাঁধের ওপর থেকে শাহ আলমের হাত সরিয়ে দিল আইরিন। কিছু বলল না।

'আইরিন, তোমার নীরতা সহ্য করতে পারছি না আমি। কিছু বল!'

'আইরিন তাকাল তার দিকে। সেই শান্ত, শীতল চোখ। 'আমাকে একা থাকতে দাও, আলম।'

শাহ আলম আবার সিগারেট ধরাল। কয়েকটা টান দিয়েই অ্যাশট্রেতে গুঁজল। জুতোর দুপদাপ শব্দ তুলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ, শাহ আলম?'

'চুলোয়!'

'শোন, রাগ কর না আমার ওপর।'

'ঠিক আছে, সুইটি, একা থাকতে চাইছ, থাক। কিন্তু মনে রেখ, ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। আমি আবার আসব। আমি জানি, কিভাবে তোমাকে জয় করতে হয়।'

হাতদু'টো কোলের ওপর ফেলে বসে রইল আইরিন। অবসন্ন দেখাচ্ছে তাকে। কোন্ খেয়ালে যেন একবার বলে ফেলেছিল, শাহ আলমের সঙ্গে সম্পর্কের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। সেই থেকে চেষ্টার অন্ত নেই শাহ আলমের। একদিন বলেছে, 'আর যাই হোক, আইরিন, লোকে এমন কথা অন্তত বলতে পারবে না যে, টাকার লোভে তোমাকে বিয়ে করতে চাই।' আইরিন হেসে বলেছে, 'দু'জন রিয়েলি ধনী লোক যদি পরস্পরকে বিয়ে করে, তার চেয়ে সুইটেবল আর কিছুই হতে পারে না। লোকের কথা ওঠার সব পথ বন্ধ।'

প্রথমদিকে আইরিন এক ধরনের সম্মোহন অনুভব করত। কয়েকদিনের মধ্যে সেটা থ্রিলে রূপান্তরিত হল। তারপর সম্প্রতি সেটা একদম গায়েব। ব্যবসার কাজে শাহ আলম যখন-তখন সিঙ্গাপুর, বোম্বাই, ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই যায়, আইরিনের জন্যে দামী একটা না একটা কিছু নিয়ে আসে। সেগুলো হাতে পেয়ে আইরিনের কেবল দুর্ভাবনাই বাড়ে।

তার আরও একটা দুর্ভাবনা প্রেসকে নিয়ে। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো আজকাল বড় বেশি মাতামাতি করছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাঁড়ির খবর নিয়ে। আইরিন-আলম প্রেম-পরিণয়ের সম্ভাবনার কথা ওই মহলে জানাজানি হলে টি-টি পড়ে যাবে।

শাহ আলম এখনো মুখ খোলেনি, তাই রক্ষে। কিন্তু কখনও কিছু বলবে না, এমন ধারণা করার কোন কারণ নেই।

কি হয়েছে আমার? কাউকে না কাউকে তো বিয়ে করতেই হবে। ভালবাসতে হবে। শাহ আলমকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে না কেন? থাকলই বা অহং। কেন তাকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করলে শিউড়ে ওঠে অন্তরাত্মা? মনে মনে বলল বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী মহিলা আইরিন।

বাবা-মা আর মামার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসেবে আইরিনের ললাট উপচে পড়েছে সম্পদে আর নগদ অর্থে। শিল্পে আর বাণিজ্যে। খুব অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছে সে। পরিণত বয়সে বাবাকেও। এত শোক সামলাতে ওকে সাহায্য করেছে সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষার গুরুদায়িত্ব। মামাও ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। সমুদ্রগামী জাহাজ কিনেছিলেন, রপ্তানি ব্যবসাতেও ভাল পসার ছিল, কিন্তু বিয়ে-থা করেননি। বোন মারা যাবার পর ভাগ্নিটাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। মামার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি পেল আইরিন।

কিন্তু একটা জিনিস সবার কাছে বিস্ময় হয়ে রইল। বাড়ি নেই আইরিনের। আইরিনের বাবা বাড়ি করাকে 'ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট' মনে করতেন। আইরিন বনানীতে বাড়ি কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর ট্রাস্টিবোর্ড বুঝিয়েছে, 'বেশি বাড়ি নিয়ে করবে কি তুমি? বিয়ের পর হয়ত দেখবে, স্বামীরই দু'তিনটে বাড়ি আছে। যেখানে-সেখানে তো আর তোমার বিয়ে হবে না! অতএব, বাড়ি করতে চাইলে বিয়ের পর কর।' এই যুক্তির

কাছে হার স্বীকার না করে উপায় ছিল না আইরিনের।

সোফা থেকে উঠে শোবার ঘরে গেল সে। দেয়ালে লাগান গিল্ট্ বাঁধান লম্বা আয়নায় সে মুখোমুখি হল।

তোমার সব আছে, আইরিন চৌধুরী, কেবল হৃদয় নেই।

মিথ্যে কথা। বলল আয়নার আইরিন।

তবে তুমি লোকটাকে ভালবাসতে পারলে না কেন? তার অযোগ্যতা কোথায়?

ঐ অহংসর্বস্ব লোকটা আমার উপযুক্ত হতে পারে না।

তোমার নিজেরও অহংবোধ প্রবল। তাকিয়ে দেখ, তোমার এই সুঠাম, সুন্দর তনুর ওপর দিয়ে সাতাশটি বসন্ত বয়ে গেছে। এখন ধীরে ধীরে ক্ষয় ধরবে মন্দিরের কারুকাজে।

আইরিন তার ছিপছিপে শরীরকে লক্ষ্য করল। তার মুখাবয়বে বিশেষত্ব রয়েছে শুধু একজোড়া চোখে। গভীর, কালো চোখ। সবসময় কথা বলে। তারপর অতি সাধারণ নাক, ঠোঁট আর চিবুক। তারপর তার শরীরের জমিনে আশ্চর্য চড়াই-উতরাই-য়ের শুরু। একটির পর একটি বিস্ময় চলেছে পায়ের নখাগ্র পর্যন্ত। কপালের কাছে বালুবেলার মত আছড়ে পড়েছে কালো চুলের ঢেউ, অথচ মাথার এলাকা ছাড়িয়ে নিচে নামতেই হঠাৎ নিস্তরঙ্গ। খুব ছোটবেলা থেকে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য আয়ত্ত না করলে বোধহয় তাকে আরও রূপসী দেখাত। অথবা, কে জানে, গাম্ভীর্য তার রূপে আরো রূপ যোগ করেছে কিনা।

আমি এখন কি করবো? অনাথিনীর মত প্রশ্ন করল আইরিন। কাকে, সে জানে না। শাহ আলম আবার আসবে।

বেশ তো।

আমাকে ভালবাসতে বাধা করবে।

মরবে তখন তুমি।

তাহলে?

পালাও।

কোথায় পালাব?

তা জানি না। শুধু জানি, না পালালে তুমি মরেছ।

মায়ের কথা মনে পড়ায় হাসি পেল আইরিনের। মা ছিলেন সিন্ধী। বাবাকে ভালবেসে পালিয়ে এসেছিলেন দেশ ছেড়ে। তখন অবশ্য দু'টোই এক দেশ ছিল। আর আইরিনকে পালাতে হচ্ছে ভালবাসা এড়াবার জন্যে।

শাহ আলম ঠিকই বলেছে, আমার চাওয়া বড় বেশি। মনে মনে বলল আইরিন, আমি যে সেই ভালবাসার পথ চেয়ে বসে আছি, যে ভালবাসা বরফ ঢাকা পাহাড় আর সবুজ বনের বুক চিরে নেমে আসা ঝর্ণার মত মনোহর, ভয়ংকর আর বিস্ময়কর। যে ভালবাসা নদীর প্লাবনের মত সর্বগ্রাসী। যে ভালবাসা শরতের মেঘধোয়া জোছনার মত স্বপ্নময়।

পালাতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, শাহ আলম আবার আসবার আগেই। আরও একবার ওর মুখোমুখি হওয়া যাবে না। তাহলে গোলমাল হয়ে যাবে সব।

গুলশানের এই পাঁচতলা বাড়িটায় দশটা ফ্ল্যাট। তৃতীয় তলার দু'টো ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে আইরিন। একটা ফ্ল্যাটে নিজে থাকে। অন্য ফ্ল্যাটে অফিস। তিনজন সেক্রেটারিকে সেখানে তিনটে

রুম দেয়া হয়েছে। স্টীলের আলমারি, কাঠের র‍্যা‍ ‍ ার সেক্রেটারিয়েট টেবিলভর্তি ফাইলপত্র আর ব্যাংকের লেজার বইয়ের মত চামড়ায় বাঁধাই করা প্রকাণ্ড আয়তনের খাতা নিয়ে তারা আইরিনের বিষয় সম্পত্তির হিসেব নিকেশ রাখে, পাহারা দেয়। হলরুমটা দেয়া হয়েছে আরও কয়েকজন স্টাফকে।

আইরিন তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে লিভিংরুমে এল।

অ্যাসট্রেতে প্রায় আস্ত সিগারেটে শাহ আলমের অস্তিত্ব। আবার আসবে সে। পালাবার জোর তাগিদ অনুভব করল সে। ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। দরজা খুলে সিঁড়ির প্যাসেজ পার হয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে।

সবচেয়ে শিক্ষিতা ও সুশ্রী সেক্রেটারি তিথি সনজিদা নিবিষ্ট-মনে ব্যাংক স্টেটমেন্টের সঙ্গে মাসিক অ্যাকাউন্টস্ বই টালি করছিল। আচমকা আইরিন ম্যাডামকে দেখে সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল।

'তিথি—'

'জি, আপা।'

'তোমাকে একটু দরকার আমার।'

আইরিন হলরুম কোণাকুণি পা'র হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরুল। লম্বা করিডর অজস্র টব দিয়ে সাজান হয়েছে। দেশী, বিদেশী ফুলের সমারোহ। তিথি তার কর্ত্রীর ড্রইংরুমের দরজার সামনে একবার এবং বিশেষত বেডরুমে ঢোকার আগে আরও একবার ইতস্তত করল। কিন্তু কর্ত্রী ফিরেও তাকালেন না। অতএব তিথিকে বেডরুমে ঢুকতে হল।

আইরিন দরজা বন্ধ করে বিছানার পাশে কুশন-চেয়ারে বসতে দিল তিথিকে।

'কি ব্যাপার, আপা?' বিস্মিত তিথি জিজ্ঞেস করল।

'তিথি, আমি কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করতে চাই।'

তিথি সনজিদার চোখ কপালে উঠল। 'আত্মগোপন!'

আইরিন নীরবে মাথা নাড়ল।

'কিন্তু···তা কি করে হয়? এখন কয়েকমাস তো আপনার এখানে থাকার কথা···ইয়ে···বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়েছে। এখন···'

'তুমি বুঝতে পারছো না, আমার মনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি আমার এনগেজমেণ্ট ভেঙে ফেলেছি, তিথি!'

'না, না,' তিথি আর্তনাদ করে উঠল। 'কি বলছেন, আপা! শাহ আলম সাহেবের মত মানুষ দেশে কয়টা আছে? আমরা অফিসের সবাই এই এনগেজমেণ্টের খবর পেয়ে খুশি হয়েছিলাম। আমাদের কোম্পানির উকিল সাহেবও বললেন···'

'অন্য কোন কারণ নেই, তিথি। আমার শুধু মনে হল, আমাদের বিয়ে হতে পারে না। শাহ আলম ছেলে হিসেবে খুবই ভাল। বলা যায়, লোভনীয়। সম্ভ্রান্ত ঘরের ধনী ছেলে। আমাদের জানাশোনাও অনেক দিনের। কিন্তু মনকে বোঝাতে পারলাম না।'

'কিন্তু, আপা···'

আইরিন সরে এসে তিথির আরো কাছে বসল। 'আমার দিকে তাকাও, তিথি।' বলল সে, 'তুমি কতদিন কাজ করছ

আমাদের অফিসে ?'

'পাঁচ বছর।'

'এই সময় তুমি তোমার এমপ্লয়ারকে বন্ধুর মত পেয়েছ। আমরা একে অপরকে চিনি ও জানি। ঠিক ?'

মাথা নাড়ল তিথি।

'তাহলে একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দাও,' আইরিন বলল, 'তুমি কি মনে কর, ইচ্ছের বিরুদ্ধে শাহ আলমকে বিয়ে করে সুখী হব আমি ?'

আমতা আমতা করল তিথি। 'একটা চান্স আছে। ইয়ে···'

'তার মানেই, উত্তরটা হল 'না'। প্রত্যেক জিনিসেরই কোন না কোন সম্ভাবনা থাকে। জীবনের সুখ-দুঃখকে তার অপেক্ষায় ফেলে রাখা যায় কি ?'

একটু ভেবে বলল তিথি, 'শাহ আলম সাহেবকে সোজাসুজি 'না' বলেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'খারাপ লাগছে আপনার অবস্থার কথা কল্পনা করে। নিশ্চয়ই খুব বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন ?'

'এখনও পড়িনি,' বলল আইরিন, 'তবে যে কোন সময় পড়ব। ভদ্রলোক বলেছেন, এত সহজে ছাড়বেন না তিনি, আবার আসবেন। ঠিক এজন্যেই পালাতে চাই আমি, বুঝতে পেরেছ ?'

মাথা নাড়ল তিথি। 'কোথায় যাবেন, ঠিক করেছেন ? বলুন, মেসেজ পাঠিয়ে দিই।'

'কোথাও মেসেজ পাঠাতে হবে না, তিথি। বলেছি তো,

আত্মগোপন করব। কোন ফর্মালিটি নয়, কোন রাজকীয় ব্যাপার নয়। বিমানবন্দরে বিদায় নেবার সময় একদল মানুষ, অন্য বিমানবন্দরে পা দিতেই আর একদলের অভ্যর্থনা, মোটরবহর নিয়ে যাত্রা, হোটেল বা গেস্ট হাউজে পৌঁছে দেখব আর একদল আগেই হাজির, এসব কোনকিছুই নয়।'

'কিন্তু আপনার নিরাপত্তার খাতিরে···'

তিথির কথা কেড়ে নিল আইরিন। 'আমি যথেষ্ট সাবধানী মেয়ে। ট্রাভেল করি প্রচুর। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমার সমস্যা হবে না। একটাই ব্যতিক্রম, এবার আমি একা যাচ্ছি। অনেককিছু নিজেকেই সামলাতে হবে। নো প্রবলেম। আই থিংক আই'ল ম্যানেজ।'

'কিন্তু আত্মগোপন করবেন কি করে? যেখানেই যাবেন, লোকে আপনাকে চিনে ফেলবে, আপা।' তিথি বলল।

আইরিন ম্লান হেসে বলল, 'আমি খুবই অর্ডিনারি চেহারার মেয়ে, তিথি। এত লোকে যে আমায় চেনে, সে আমার চেহারার কারণে নয়, এক্সপেনসিভ প্রটোকলের কারণে। এয়ারপোর্টে মালা, হোটেলে ফুলের তোড়া, সামনে-পিছনে অ্যাটেণ্ডেন্টের ভিড়, কল-কারখানা পরিদর্শনে গেলে সঙ্গে দশটা কার, সোশ্যাল ওয়ার্কে গেলে পাঁচটা জীপ, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, হাততালি, বক্তৃতা, রিপোর্টারের ভিড় এইসব কারণে। মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, তিথি। এ এক বন্দী জীবন। তোমার মত কারও সঙ্গ পাবার স্বাধীনতা আমার নেই। কাউকে সঙ্গ দিতে হলেও নানা আনুষ্ঠানিকতার ঝামেলা এড়াতে হয়। এত ঝামেলা

বোধহয় আমাদের প্রেসিডেন্টেরও নেই।'

মাথা নিচু করে তিথি বলল, 'তা নেই, স্বীকার করি। কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল, আমাদের সঙ্গ আপনি উপভোগ করেন।'

'তোমার কথা আলাদা, তিথি। তুমি তো বন্ধুর হৃদয় দিয়ে বন্ধুকে সঙ্গ দাও। বেশির ভাগ লোকই দায়িত্ব পালন করে কোন না কোন নির্দিষ্ট স্বার্থের মাপকাঠিতে। সে কথা থাক। সাধারণ চেহারার একটা মেয়ে সাধারণ লোকের মত কোথাও বেড়াতে গেলে কেউই বুঝতে পারবে না।'

'আপনি গ্রেটা গার্বোর মত কথা বলছেন, আপা।' তিথি অভিযোগের সুরে বলল।

আইরিন বলল, 'গ্রেটা গার্বো হয়ত একই রকম অনুভব করতেন। তাঁর অনুভবের ক্ষেত্র, বিষয় অনেক বড়। কিন্তু আমি এখন একটা কারণেই পালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তা হল, শাহ্ আলম।'

'আপনার জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে, আপা।' ভারী শোনাল তিথির কণ্ঠস্বর।

'আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। কোথায় যাব, জিজ্ঞেস করছিলে না?'

'জ্বি, আপা।'

'ঠিক করিনি। তুমিই একটা পরামর্শ দাও।'

'চট্টগ্রাম যাবেন?'

'চট্টগ্রাম!' বিড়বিড় করল আইরিন। 'ভাল প্রস্তাব। অনেকদিন চট্টগ্রাম যাই না।'

তিথিকে উৎসাহিত মনে হল। 'চেষ্টা করে দেখব, বুকিংয়ের কোন ব্যবস্থা···?'

'থাম!' বাধা দিয়ে বলল আইরিন, 'ঐ কাজের ধারেকাছেও যেয়ো না। একদম চুপচাপ কেটে পড়ব আমি। কেউ জানবে না। মনে থাকবে তো? কাউকেই বলবে না। শুধু আমরা দু'জনই জানব, আমি কোথায়।'

'আপনি চট্টগ্রামেই থাকবেন, আপা?'

'না। চট্টগ্রাম ব্যস্ত শহর। ভাল লাগে না এত ব্যস্ততা। আমি বরং থাকব কক্সবাজার।'

'সেই ভাল, আপা।'

'কয়েকটা ভাল হোটেল আছে ওখানে। খুঁজে জায়গা করে নেব একটা।'

'কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল তিথি।

'বলতে পারব না। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার বলতে পার। জানি না, কতদিন মন বসবে।'

তিথি সাবধান করতে চাইল, 'এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনা খুব সুখকর হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে খুবই দুঃসহ হতে পারে।'

তখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসব,' আশ্বাস দিল আইরিন, 'খামোকা নিশ্চয়ই ভুগতে যাব না।'

'অন্তত টেলিফোন করে একটা ভাল রুমের ব্যবস্থা করতে দিন আমাকে।'

এ অনুনয়ে সাড়া মিলল না। আইরিন বলল, 'অজ্ঞাতবাসের

সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি, তখন সবকিছুই নিজে করব। নামটাও পাল্টে নেব, ঠিক করেছি।'

ইয়েলো ডিয়ার গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর স্বত্বাধিকারিণীর সেক্রেটারি চোখ কপালে তুলল।

'আপা, কি বলছেন আপনি? নাম পাল্টাবেন কিভাবে? দরকারই বা কি?'

'আই মিন হোয়াট আই সে, মিস তিথি, অজ্ঞাতবাস ইজ অজ্ঞাতবাস। আত্মগোপন আত্মগোপনই। চেহারায় না চিনুক, নামে আমাকে চিনে ফেলবে যে কেউ, যে কোন জায়গায়। তুমি ভেবেছ, আইরিন চৌধুরীর নাম শুনলে কক্সবাজারে হৈ চৈ পড়বে না? তাহলে অজ্ঞাতবাসে গিয়ে লাভ কি আমার?'

কথাটা লুফে নিল তিথি, 'সত্যিই তো, আপা, কি দরকার এত হাঙ্গামায়? বিপদে পড়লে আমাদের কাউকেই কাছে পাবেন না।'

'পাগল হয়ে যাব তাহলে, তিথি, তিথির কাঁধে হাত রেখে বলল আইরিন, 'এত শিগগির শাহ আলমের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে একটুও নেই আমার। সিনের পর সিন, আরগুমেন্টের পর আরগুমেন্ট, এই চলতে থাকবে এখন। আমার নার্ভে এত শক্তি নেই। তিথি, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। শাহ আলম খুবই পারসিসটেন্ট টাইপের লোক। সত্যিই সহজে ছেড়ে দেবে না সে।'

'সরু ড্রাইভওয়ে দিয়ে খুব জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আমার বেশ ভয় করছিল, গেটে না ধাক্কা লেগে যায়। তখনই অনুমান করলাম, মুড খারাপ বেচারার। কোথায়

গেলেন তিনি ? কি মনে হয় আপনার ?'

'হয় গুলশান মার্কেটে গেছে আমার জন্যে দামী কোন গিফ্‌ট কিনতে, নয়তো অন্য কোন বান্ধবীর কাছে জ্বালা জুড়াতে গেছে। ঠিক জানি না।'

কিছুক্ষণ নীরবে ভাবল তিথি। তারপর মাথা তুলে কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

'কি ভাবলে, বল।'

'একটাই বুদ্ধি দেখতে পাচ্ছি, আপা। আমাদের জয়দেবপুর প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রিতে একটা মেয়ে রিসেন্টলি জয়েন করেছে।'

'কি হিসেবে ?'

লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। গত বছর এম.এ. পাস করেছে সোশ্‌ল ওয়র্কে। নাম তামান্না হক। চেহারায় আপনার সাথে বেশ সাদৃশ্য আছে।'

'তামান্না ?···আমি দেখেছি ?' আইরিন স্মরণ করতে চেষ্টা করল।

'আপনি দেখেছেন। ওর ইণ্টারভিউ হেড-অফিসেই হয়েছিল। হয়ত মনে নেই আপনার।'

'হ্যাঁ, তারপর ?'

'ওর আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রেখে আপনি তামান্না হক হয়ে কয়েকদিনের জন্যে ডুব দিতে পারেন। কিন্তু, আপা, আপনাকে আবার সাবধান করতে চাই, জিনিসটা খুবই রিস্কি হয়ে যাচ্ছে।'

'গোসল করা একটা রিস্কি কাজ, তিথি, এমনকি ইলিশ মাছ খাওয়াও। সেসব ভাবলে তো আর চলছে না। তুমি ওর আই-

ডেন্টিটি কার্ড আনার ব্যাবস্থা কর। কুইক!'

চটপটে মেয়েটা নিমেষের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আইরিন বিছানার অন্য পাশে কাচের সুদৃশ্য টিপয়ের ওপর রাখা হাউজ টেলিফোনের রিসিভার তুলল।

'হাজিরন?' জিজ্ঞেস করল সে, 'আমি কয়েকদিনের জন্যে বেরুচ্ছি। কয়েকটা কাপড় ছোট নীল ব্যাগে পুরে ফেল, কেমন?···হ্যাঁ, কয়েকদিনের মত···না, লাগবে না···হ্যাঁ, চপ্পল দিও এক জোড়া···গহনাগাটি কিছু লাগবে না···ঠিক আছে।'

হাজিরনের সঙ্গে কথা শেষ করে খবরের কাগজে চোখ বোলাল অস্থিরভাবে। কোন নিউজই ভাল করে পড়ল না। হেডিং পড়ল শুধু।

শিক্ষা সংস্কার বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে পার্লামেন্টে বিতর্ক; ধরমপুরে রাজনৈতিক নেতা খুন; এন ই সি'র সাত কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন; সার্কের অষ্টম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্যে চেয়ারম্যান সমীপে মরিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট এ. আই. তোকোর আহ্বান; বার্মায় নৌকাডুবিতে নিহত ৪০···

তিথি ঢুকল সবুজ ক্লিপ ফাইলে তামান্না হকের আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে। খবরের কাগজ উল্টে রেখে ফাইলের সামনে ঝুঁকে পড়ল আইরিন।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ইনডিড,' বলল সে, 'এটা আমার কাছে থাক। তুমি এখন আমাকে আর একটা ফেভার কর।'

'বলুন, আপা।'

'এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে দেখ, চট্টগ্রাম যাবার কোন প্লেন আছে কিনা। আমার নাম বলবে না।'

'কিন্তু সিট রিজার্ভেশনের জন্যে নাম তো বলতেই হবে, আপা।'

একটু থেমে হেসে ফেলল আইরিন, 'আরে! ভুলেই গিয়েছিলাম। তামান্না হকের জন্যে একটা সিটতো আমরা নিশ্চয়ই রিজার্ভ করতে পারি।'

'তা পারি,' দ্বিধা জড়িত স্বরে বলল তিথি, 'কিন্তু কাজটা বেআইনী হয়ে যাচ্ছে না?'

'তোমাকে জেলে যেতে দেব না, তিথি,' আইরিন বলল, 'দায়দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধেই থাকবে। যদি আটকে যাও, বলব, তুমি যা করেছ, আমার ইচ্ছেতেই করেছ। তোমার কোন দোষ নেই।'

'তামান্না যদি তার আইডেন্টিটি কার্ড চায়?'

'বলবে, আমার কাছে আছে।'

তিথি তার কর্ত্রীর আরও কাছে সরে এল। 'আপা, একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'বল।'

'পৌঁছে আমাকে একটা টেলিফোন করবেন এবং খবর দেবেন, কোথায় উঠেছেন। ধরুন, যদি কিছু একটা ঘটে, সেক্ষেত্রে···?'

'কি ধরনের কিছু একটা?'

'এই, ধরুন, ডাকাতি, চুরি, ফায়ার, অ্যাকসিডেন্ট, কারও

মৃত্যু।'

'শোন, তিথি,' আইরিন ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার নিজের কিছু ঘটলে তুমি আমাকে খবর দিতে পারছ না। অন্য আর কি ঘটতে পারে? মায়ের অসুখ, বাবা দুর্ঘটনার শিকার, কিংবা বোনের বাচ্চা হবে এই ধরনের কোন খবর আমার জন্যে নয়। বাড়িতে যদি আগুন লাগে, কি আর করা? বাড়িও আমার নয়। আমার আছে কেবল একটাই জিনিস—অজস্র টাকা। সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব ব্যাংকের। সে টাকার 'পরেও আমার মায়া নেই।'

তিথি বলল, 'আপা, অকৃতজ্ঞের মত শোনাচ্ছে কথাগুলো। টাকা আপনাকে আরাম-আয়েশ ছাড়াও আরও অনেক জিনিস দিয়েছে। মানুষের অকুণ্ঠ আনুগত্য দিয়েছে আপনার প্রতি।'

'এই মানুষগুলোর মূর্খতা আমাকে দুঃখ দেয়, তিথি। আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যকে যারা আমার সৌভাগ্য মনে করে, তারা জানে না, এ ঐশ্বর্য আসলে অন্যায়ভাবে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া। বালজাক বলেছেন, বিহাইণ্ড এভ্‌রি ফরচুন দেয়ার ইজ এ ক্রাইম। অথচ সৌভাগ্যলাভের আশায় এই অর্ধশিক্ষিত, মহা-মূর্খরা আমাকে তোয়াজ করে। মন খারাপ করে দিয়ো না, তিথি। জীবনে এই প্রথম একলা কোথাও যাচ্ছি। খুবই সিরিয়াস ব্যাপার আমার কাছে। নিজেকে খুবই সাহসী মনে হচ্ছে।'

'খুব সুখী মনে হচ্ছে আপনাকে।'

'হবে না? এক ধরনের বন্দী জীবন যাপন করি আমি। আজ

মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি।'

'অথচ, আপা, আমার ধারণা ছিল, আমাদের সাহচর্যে আপনি সুখী।' তিথির চোখ ছলছল করে উঠল।

আইরিন তিথিকে কাছে টেনে নিয়ে তার গালে গাল রাখল। 'তুমি খুব ভাল মেয়ে, তিথি। আই অ্যাম টেরিব্‌লি ফণ্ড অভ ইয়ু। কিন্তু কয়েকটা দিন আমাকে মুক্ত বিহঙ্গ হতে দাও। একেবারে নিজের মত করে হারিয়ে যেতে দাও। সত্যিকারের কোন অসুবিধায় পড়লে তোমাকে খবর দেব।'

চোখ মুছে তিথি বলল, 'কথা দিচ্ছেন?'

'টাকা ফুরিয়ে যাবে, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হবে?'

তিথি দাঁতে জিভ কাটল। 'ছি ছি, একটুও খেয়াল ছিল না।' দৌড়ে ক্যাশ সেকশন থেকে টাকা আনল তিথি। পাঁচশো টাকার অনেকগুলো নোট জোর করে পুরে দিলো আইরিণের হাতব্যাগে। সুন্দর ছোট হাতব্যাগ, হরিণের চামড়ার তৈরি। রূপার স্ট্রিপে বাঁধান। দুই ধার বৃত্তাকার, নলের মত।

নিজের গাড়ি নিতে রাজি হল না আইরিন। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল ট্যাকসির জন্যে।

'টাকা আরো লাগবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল তিথি।

আইরিন বলল, 'লাগলে তোমাকে টেলিফোন করব। পাঠিয়ে দিও।'

'ঝুঁকি নেবেন না, আপা, আমি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকব।'

'তোমরা ভাল থেক। চলি, তিথি। খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।'

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বিমর্ষতা কেটে গেল আইরিনের। মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ। নতুন দায়িত্বের এক ধরনের আনন্দ আছে। আইরিনের নতুন দায়িত্ব সে নিজে। আপাতত তামান্না হক।

প্লেন আকাশে উড়ল। সিটবেল্ট খুলে আইরিন তাকাল নিচের ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে। লিলিপুটের ঘরবাড়ি। চুলের ফিতের মত রাস্তা। ছোট হয়ে আসছে ঢাকার বিশাল যন্ত্রণাময় অস্তিত্ব। ফিকে হয়ে আসছে শাহ আলমের স্মৃতি।

এই স্মৃতি কবে ভুলতে পারবে সে? নিজের কাছেই প্রশ্নের উত্তর পেল আইরিন। যেদিন সেই ভালবাসা খুঁজে পাবে সে, যে ভালবাসা নদীর প্লাবনের মত সর্বগ্রাসী, যে ভালবাসা শরতের মেঘধোয়া জোছনার মত স্বপ্নময়।

আধোঘুমে, আধো জাগরণে সেই ভালবাসার স্বপ্ন তার চোখে বিস্ময়কর সব চেহারা নিয়ে ধরা দিতে থাকল।

দুই

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে আইরিন দেখল, চারপাশের সবকিছু তার অচেনা। সে যেন রূপকথার এলিস, ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে এসে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। বিছানা, বালিশ, মাথার ওপরের ছাদ, জানালার পর্দা, সব নতুন। এমনকি যে রোদের খণ্ড চোখের ওপর লুটিয়ে পড়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছে, সেও যেন অচেনা।

ক্ষণিকের জন্যে বুকের নিভৃত কোণে বেদনা অনুভব করল আইরিন। সেটা পরিচিত, অভ্যস্ত জিনিসগুলোর জন্যে এক ধরনের নস্টালজিয়া—যেন হাজিরন এসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকছে, 'ও আপা, উঠবেন না? টেবিলে নাশতা দিছি'; অফিসে কর্ম চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে; টেলিফোন বাজছে। শাহ আলমের রুটিন কল, নিচে গ্যারেজে গাড়ি পরিষ্কার করে রেডি করা হচ্ছে আইরিন যেখানে যেতে চায় নিয়ে যাবার জন্যে ...এইসব।

গতরাতে খুব খারাপ লেগেছিল তার। কেবল শাহ আলমের কাছ থেকে পালিয়ে আসার জন্যে এত তাড়াহুড়া করার কোন

দরকার ছিল না। মন-নৌকার হাল একটু শক্ত করে ধরলেই হত। শুধু 'দেখা করব না' কথাটা মুখ থেকে বের করলেই পারত সে। শাহ আলম তার ধারেকাছে ভিড়তে পারত না। অথচ চুপিসারে, নাম পাল্টে, বিনা প্রস্তুতিতে সে এত দূরে চলে এল। চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে নামার আগে পর্যন্ত স্থির করেছিল পরের প্লেনে চড়ে ফিরে যাবে। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না।

কিন্তু কক্সবাজার পৌঁছে আইরিন অনুভব করল, তার ডিপ্রেশন কেটে গেছে। ভালই লাগল কাঁধে নীল জানিব্যাগটা ঝুলিয়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের মত অনায়াস ভঙ্গিতে টারম্যাকের দিকে হেঁটে যেতে। ট্যুরিস্ট গাইড ঘেঁটে একটা হোটেল পছন্দ করল। তারপর ট্যাক্সি ভাড়া করে তাতে চেপে বসে হুকুম করল, 'হোটেল হাওয়াই চল।'

নার্সদের মত সাদা শাড়ি পরা সুশ্রী চেহারার একটা মেয়ে তার রুম গুছিয়ে দিল। মেয়েটি বারবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। হয়ত সে কোন দেশী মেয়েকে এভাবে একলা বেড়াতে আসতে দেখেনি। বিস্মিত হচ্ছিল আইরিনও। 'হাওয়াই'-এর মত হোটেলগুলোতেও আজকাল মেয়েরা রুম-সার্ভিসে কাজ করছে।

'চাকরিটা কেমন লাগে আপনার?' আইরিন জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, 'প্রফেশন হিসেবে এটা তো নতুন।'

'ভালই লাগে,' বিছানার শীট টানটান করে বিছাতে বিছাতে উত্তর দিল মেয়েটি, 'মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে।'

'পরিবেশ কেমন মনে হয়? কখনও মনে হয় না, আপনি খারাপ হয়ে যাবেন?'

হাসল মেয়েটি। 'ম্যাডাম,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল সে, 'যে খারাপ হবে, মাদ্রাসায় চাকরি করেও হতে পারে। পরিবেশ আমাদের হাতের জিনিস, যেমন খুশি গড়ে নিতে পারি আমরা।'

কথাটা ভাবিয়ে তুলেছিল আইরিনকে। ঠিকই বলেছে সে। অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছে আইরিন কথাটা। পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না—শুধু এই ভয়েই সে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ধারণাটা ঠিক নয়। স্রেফ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সে তার কাজ, পরিচিত পরিবেশ, আরাম-আয়েশ, সব ত্যাগ করে অজানায় হারিয়ে যেতে ছুটে এসেছে। শাহ আলমের অস্তিত্ব তার পরিবেশকে কি এতই ভয়ংকর করে তুলেছিল? কেন সে ভালবাসতে পারল না তাকে? কি ক্ষতি হত তাকে ঘিরে সুখের নীড় বাঁধার চেষ্টা করলে?

বছরের পর বছর গেছে, আইরিন কাঁদেনি। কিন্তু কাল রাতে নতুন পরিবেশে, অজানা অন্ধকারে বালিশ আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলেছে সে। কয়েকবার ঘুমের মধ্যে চমকে জেগে উঠেছে। বুকের ভেতরে দুর্বোধ্য শূন্যতার বেদনা। কি যেন নেই তার। কি যেন হারিয়ে ফেলেছে।

এখন ঘুম থেকে উঠে শাওয়ার নিয়ে, কাপড় পাল্টে, ব্রেকফাস্ট সেরে ব্যালকনির ইজি চেয়ারে বসে আবার ভাল লাগছে সবকিছু। চলুক না কয়েকটা দিন এইভাবে। নতুন অভিজ্ঞতায় তার মন নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।

এত ভাবছ কেন, আইরিন? অল্পে দুর্ভাবনা হবার মত বয়স তোমার এখনও হয়নি। এখনও তুমি লাবণ্য আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ঝলমলে তরুণী। এই বসন্তেও যদি তুমি বিমর্ষ থাক, পৃথিবী অন্ধকার হয়ে থাকবে। নিজেকে বলল সে।

এই উদ্যম থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়, আইরিন, আধঘণ্টা সময় দেয়া হল তোমাকে।

আইরিন উঠে পড়ল। টাঙ্গাইল তাঁতের ম্যাকসি খুলে গোলাপী শাড়ি পরল একটা। হালকা মেকআপ নিল। লিপস্টিকের পরিমাণ পরখ করে নিল আয়নায়। চুলে চালাল ওর প্রিয় যশোরের চিরুণি। হাতব্যাগে চাবি নিয়ে স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজার অটোম্যাটিক লকের বাটন টিপে। যেন বাইরে জরুরী দরকার তার।

বড় রাস্তা পার হয়ে কংক্রিটের পায়ে হাঁটা সরু পথে নামল সে। এটা চলে গেছে বালুবেলা পর্যন্ত। পিকনিকের সিজন্ শেষ হবার পথে। তবু কয়েকটা বাসভর্তি পিকনিক দল চোখে পড়ল। মোটেলের স্পটগুলোতে ছোট ছোট জটলা। দু'শো গজ দূরে নীল সমুদ্রের ঢেউ হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। ভারি খুশি লাগছে। এই বিশাল বালুবেলা তার। ঐ অনন্ত সমুদ্র তার। আর আছে তার অখণ্ড অবসর। নতুন করে নিজেকে খুঁজে পাবার এই অবকাশ তার। ছোট্ট মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে ছুটতে ইচ্ছে হল। অল্প বয়সে প্রভূত বৈভবের মালিক হয়ে সে বুড়িয়ে গিয়েছিল। সমবয়সীরা তার সঙ্গে সমবয়সীর মত মেশেনি। বয়োজ্যেষ্ঠরা তাকে সম্মান করে চলে। একটি ঘটনা

সে কখনো ভুলতে পারবে না। পঞ্চাশোর্ধ এক প্রৌঢ় একদিন দর্শনার্থী হলেন তার। আইরিন তাদের জয়দেবপুরের নতুন প্রজেক্টের কাগজপত্র চূড়ান্ত করা নিয়ে তখন মহাব্যস্ত। তবু তিথির মুখে যখন শুনল, দর্শনার্থী প্রৌঢ় এবং বহুদূর থেকে এসেছেন, তখন শত ঝামেলার মধ্যেও কল স্লিপে 'ও. কে.' লিখল। সালাম দিয়ে প্রৌঢ় বললেন, 'আমি মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় নেব আপনার।'

'বলুন।'

'আমি একটা ইণ্ডাস্ট্রি করার অনুমতি পেয়েছি। কাজ শুরু করব। ব্যাঙ্কে আমার যত টাকা আছে, সব টাকা তুলে ফেলব। এই তার চেক।'

চেকটা তিনি আইরিনের হাতে তুলে দিলেন।

'কিন্তু এটা নিয়ে আমি কি করব?'

'আপনি···যদি কিছু···মনে না নেন, দয়া করে এটাতে পায়ের একটু ধুলো···মানে···আমার ইণ্ডাস্ট্রির সৌভাগ্যের জন্যে···'

'এসব কি বলছেন আপনি?' উত্তেজনার আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আইরিন। 'আপনি আমার বাবার বয়সী।'

'জানি, মা,' কাঁদোকাঁদো স্বরে প্রৌঢ় বললেন, 'আমি দুর্ভাগা লোক। বিজনেসে লোক কোনদিন আমাকে ফেবার করেনি। আপনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি। আপনার পায়ের ধুলো আমার ইণ্ডাস্ট্রির কপাল ফিরিয়ে দিতে পারে।'

চেকের পিঠে চুমু খেয়ে চেকটি ফেরত দিয়েছিল আইরিন। 'দেখুন, এসব লাকের ব্যাপার নয়, হিসেবের ব্যাপার। ঘটনা-

দুর্ঘটনার ব্যাপার। আপনার শিল্পের ফিজিবিলিটি, প্ল্যানিং-এর সমস্ত কাগপত্র একসময় নিয়ে আসবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে চোখ মুছতে মুছতে প্রৌঢ় বিদায় নিয়েছিলেন। সেদিন বাকি কাজ শেষ করা আর হয়ে ওঠেনি আইরিনের। ঝপ্ করে ওর খোঁপা খুলে দিল হাওয়া। এত প্রচণ্ড হাওয়া এখানে, ভাবতে পারেনি। আরও শক্ত করে বাঁধা উচিত ছিল। কিছুতেই বাগ মানান যাচ্ছে না ওগুলোকে। শরীরের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে উড়ছে তার দীর্ঘ চুলের রাশি।

স্যাণ্ডেল খুলে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে সে ঢেউয়ের আদর পায়ে কুড়োতে কুড়োতে। পিপাসার্ত বোধ করল সে। ঘাড় উঁচু করে দেখল, খাড়া তীর বেয়ে ওপরে উঠলেই সে কয়েকটা ড্রিংকস্ কর্ণার পেতে পারে। অথবা যেটুকু পথ এসেছে তার দ্বিগুণ পথ ঘুরে যাওয়া যায় সেখানে। কি করবে? এত তৃষ্ণা নিয়ে অতখানি কষ্ট করার কোন মানে হয় না। সামান্য একটু ঝুঁকি নিলেই হয়। পা ধুয়ে স্যাণ্ডেল পরল সে। তারপর খাড়া তীর বেয়ে উঠতে শুরু করল।

প্রায় উঠে পড়েছে, সেই সময় দুর্ঘটনা। পাথরের ওপর মাটি বালু জমে পিছল হয়ে ছিল জায়গাটা, আইরিন বুঝতে পারেনি। পা দিতেই সহসা গড়িয়ে পড়ল। নিচে রুক্ষ পাথরের চাঁই। কিন্তু সবিস্ময়ে সে দেখল, তার হাড়গোড় ভাঙেনি, ব্যথাও লাগেনি। 'তার কটিদেশ বেষ্টন করে ধরে অসমতল পাথরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একজন। চিৎকার করার জন্যে গাল

হাঁ করেছিল আইরিন, হাঁ করাই রয়েছে, চিৎকার করার দরকার হয়নি। কয়েক সেকেণ্ড লাগল স্বাভাবিক হতে।

নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণে তার ত্রাণকর্তা জিজ্ঞেস করল, 'লাগেনি তো?'

দম নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে আইরিন বলল, 'না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। জোর বাঁচিয়েছেন।'

আইরিনের কোমর থেকে হাত সরিয়ে লোকটি দুই ফুট ব্যবধানে দাঁড়াল। আইরিন লক্ষ্য করল, সাহেবী ইংরেজিতে কথা বললেও তার চেহারা পুরোপুরি এশীয়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি বয়স। লম্বা, পেটা শরীর। প্রশস্ত কাঁধ। নেভিব্লু জিন্সের প্যাণ্টে ইন করে পরেছে দুধসাদা চাইনিজ শার্ট। পায়ে ক্রেপ সোলের কালো জুতো। কোঁকড়ান ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ান। তার নিচে প্রশস্ত কপাল, কপালের নিচে সপ্রতিভ উজ্জ্বল চোখে বন্ধুত্বের হাসি।

আইরিন কষ্ট করে হাসল। এখনও তার বুক ধুকপুক করছে। তার ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের সমান্তরাল ছন্দে সামনের পাথরের ওপর দাঁড়ান লোকটির কয়েক ফুট নিচে আছড়ে পড়ছে উর্মিমুখর বঙ্গোপসাগর, ফিরে যাচ্ছে অনন্ত সুদূরে, আবার নতুন ঢেউ এসে সেখানে ভেঙে পড়ছে। চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারল না আইরিন। ঠিক এই দৃশ্য সে কোথায় দেখেছে! তার মানসপটের কোনখানে ঠিক এই ছবি আঁকা হয়েছিল জন্মান্তর থেকে।

'আমি দুঃখিত,' ইংরেজিতে বলল আইরিন, 'বোকামি হয়েছে। সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার।'

'আপনার সৌভাগ্য, সময়মত ধরে ফেলেছিলাম,' লোকটি বলল। 'পাথরগুলো পিচ্ছিল। নিচে পড়ে গেলে আপনার হাড়-গোড়ের জন্যে বিশেষ সুবিধের হত না।'

আইরিন বলল, 'এই জায়গাগুলোর দিকে কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া উচিত, কি বলেন?'

লোকটি বলল, 'কেন দেবে? হোটেল-মোটেলগুলো থেকে আয় হয়, ওগুলো তাই যত্নে আছে। বীচে নামার জন্যে তো কেউ ভাড়া দেয় না। তাই না?'

'কিন্তু বীচের জন্যেই তো হোটেলগুলোতে লোক থাকে। আমার কিছু হলে সোজাসুজি মামলা করে দিতাম।'

হাসল পটের পুরুষমূর্তি। 'আপনাদের দেশে, কিছু মনে করবেন না, মামলা নিষ্পত্তি হতে বছর বছর সময় নেয়। শুনেছি, ভদ্রলোকেরা এজন্যে মামলার ঝামেলায় যেতে চায় না।'

ভারি সুন্দর করে কথা বলে লোকটি। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে একেবারে ভেতর থেকে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। লোকটি ইউরোপীয় নয়, আবার বাঙালিও নয়। কোন্ দেশে বাড়ি তার? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেল আইরিন। দু'টো কথা হতে না হতেই এত প্রশ্ন ভদ্রতা নয়।

'ড্রিংকস্ কর্ণারে যেতে চেয়েছিলেন, না?'

লোকটির প্রশ্নে বিস্মিত আইরিন। জড়ান গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মানে···'

'ঘাবড়াবেন না। আমি খট রিডার নই। এটা কমনসেন্সের ব্যাপার। চলুন, আমারও গলা শুকিয়ে গেছে।'

আইরিন একবার ওপরে, একবার নিচের দিকে তাকাল। লোকটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দ্বিতীয়বার ঝুঁকি নেবার আগে বরং আমার সাহায্য নিন।'

ড্রিংকস কর্ণারে একটা টেবিলে লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আর এক দফা বিস্ময়ে অভিভূত হল আইরিন। ওয়েটারকে ডেকে সে দু'টো সফট ড্রিংক দিতে বলল। এবার বিশুদ্ধ বাংলায়। তবে কি দেশেরই লোক সে? অথবা ভারতীয় বাঙালি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আইরিন লক্ষ্য করল, লোকটি তাকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অবলোকন করছে। ঐ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আইরিন বলল, 'আমরা কেউ কাউকে চিনি না। পরিচয় হওয়া উচিত আমাদের।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বলল সে, 'আমার নাম আরিফ ইফতিখার।'

'আমার নাম,' ঢোক গিলে আইরিন বলল, 'তামান্না হক।'

'আপনাকে বিদেশিনী ভেবেছিলাম।'

'তাই নাকি? কেন, আপনি বিদেশী বলে?'

একটু থেমে আইরিনের দিকে তাকাল আরিফ। তারপর বলল, 'আমাকে দক্ষিণ এশীয় বলতে পারেন। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপে বাড়ি।'

'তাই? আপনার ইংরেজি কিন্তু খোদ বিলেতীদের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু চেহারা ইউরোপীয় নয় দেখে কনফিউজড ছিলাম।'

'ধন্যবাদ। এটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিচ্ছি। ইংরেজির চর্চা আমাদের উপমহাদেশে ত্রুটিপূর্ণ। আমি ওটা শিখেছি বিলেতেই।

অবশ্য আপনার ইংরেজিও খুব ভাল, ভুল ধরার চান্স নেই।'

'কোন দেশে বাড়ি আপনার? শ্রীলংকা, না মালদ্বীপ?'

'আপনার কথা বলুন, মিস হক।'

'আমার কথা খুবই সামান্য। বাড়ি ঢাকায়। ছুটি কাটাতে এসেছি। চাকরির একঘেয়েমীতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

'যদি আপত্তি না থাকে, কি করেন আপনি, জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! আমি একটা গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর এম ডি'র সচিব। গুলশানে অফিস।'

ভেতরে ভেতরে ঘামতে থাকলো আইরিন। এত কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে, সে ভাবেনি। মিথ্যে বলায় পারদর্শিতা নেই তার। কখন মুখ ফসকে একটা সত্যি বেরিয়ে পড়বে, আর তার অ্যাডভেঞ্চার মাঠে মারা যাবে, কে জানে! লোকটি নিশ্চয়ই জানবে, সে হোটেল হাওয়াই-তে উঠেছে। সেক্রেটারির চাকরি করে এমন একটা মেয়ে এতো দামী হোটেলে ওঠার সামর্থ্য রাখে কিনা, যে কারো মনে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তামান্না হক কত বেতন পায় মনে করার চেষ্টা করল সে। বেতন অবশ্যই বাড়িয়ে বলতে হবে, সেরকম কোন কথা উঠলে। আরিফ কি একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। শুরুতেই বাধা দিয়ে আইরিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও কি ছুটি কাটাতে এসেছেন?'

'বলতে পারেন,' আরিফ বলল। 'বাংলাদেশে বহুবার এসেছি, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কক্সবাজার দেখিনি কখনও।'

'আমিও,' আইরিন বলল, 'গতকাল প্রথম পা দিয়েছি এখানে।'

চমৎকার করে হাসল আরিফ। 'ভালই হল। আমরা দু'জনেই এখানে নবাগত। একসঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে জায়গাটা, কি বলেন?'

আইরিন উত্তর দিল না। কি করবে ভেবে না পেয়ে অকারণে হাতব্যাগ খুলল ও রুমাল বের করে মুখ মুছল।

হাসল আরিফ। 'বিব্রত করলাম মনে হচ্ছে আপনাকে। সদ্য পরিচিত একটা লোক একসঙ্গে ঘোরার প্রস্তাব দিয়ে বেশ বেকায়দায় ফেলেছে, তাই না?'

উত্তর না দিয়ে ডাগর চোখ মেলে আইরিন শুধু আরিফের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির অর্থ, কথাটা সত্যি অথচ স্বীকার করার মত দ্ব্যর্থহীন নয়। আরিফ সে দৃষ্টি উপভোগ করল।

'মিস হক, একটা বাস্তব পরামর্শ দিই আপনাকে। আপনাদের দেশে মেয়েরা সাধারণত এভাবে একা বেড়ায় না। নিরাপদও নয় সেটা। কাউকে না কাউকে সঙ্গে রাখা ভাল। বিদেশী হিসেবে আমার দিক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হিসেব করে দেখুন, খুব সামান্য। অবশ্য আমার চেয়েও নির্ভরযোগ্য কেউ এখানে আপনার জানাশোনা থাকলে সে কথা আলাদা।'

'যুক্তিপূর্ণ কথা, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একটা ছোট্ট অসুবিধা আছে।'

কোকা-কোলার বোতল মুখ থেকে নামিয়ে আগ্রহভরে আরিফ সদ্য পরিচিতার দিকে তাকাল।

'একলা ছুটি কাটাবার নাম করে এখানে এসে আমি একজন অচেনা পরদেশীর সঙ্গে ঘুরছি, কথাটা জানাজানি হলে বিপদ

হবে আমার।'

'জানাজানি হবে কেন? ভিড়ের মধ্যে দু'চারজন লোক থাকতে পারে, যারা আমাদের চিনতে পারে। ভিড় এড়িয়ে চললেই হল। তাছাড়া স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আমার পরিচিত কেউ নেই। বোধহয় আপনারও নেই, তাই না?'

মাথা নাড়ল আইরিন।

'চমৎকার! তাহলে একটা রফা হল আমাদের মধ্যে। খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে নিজেকে। নিঃসঙ্গ প্রবাসে আপনার মত রূপসী ভদ্রমহিলার সঙ্গ পাওয়া খুব দুর্লভ ব্যাপার।'

আইরিন হাসল। 'বেশ, রাজি। একটু ঝুঁকিই নিলাম। ধরে নিচ্ছি, আপনি লোক হিসেবে তেমন বিপজ্জনক হবেন না।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসল আরিফ। 'আপনি খুব সরল মেয়ে। কোন ধরনের বিপজ্জনক লোকের কথা মিন করছেন? চোর-ছ্যাঁচড়? আপনার ব্যাগ কিংবা কানের সোনা ছিনিয়ে নেব কিনা, তাই?'

'হতেও তো পারেন। কেবল তা কেন, আপনি স্পাইও হতে পারেন। হয়ত কোন গোপন মিশনে বাংলাদেশে এসেছেন।'

হো হো করে প্রাণ খুলে হাসল আরিফ। 'খুব দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছেন, মিস তামান্না হক। ছোটবেলা থেকে সাধ, জেমস্ বণ্ড হব। কোন জেমস্ বণ্ডের কথা বলছি, বুঝতে পেরেছেন? ইংল্যাণ্ডের ন্যাশনাল হিরো। অমন হিরো আপনাদেরও একজন আছে, শুনেছি।'

আইরিন হাসিতে যোগ দিল। 'হুঁ। মাসুদ রানা। স্বাধীনতা

যুদ্ধের সময় একবার কি হয়েছিল জানেন? এক সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে পাঠান হয়েছিল এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে। মিশন শুরু করার আগের রাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল বেচারা। প্রায় পিছিয়ে এসেছিল। ঘুম আসছিল না বলে একখানা মাসুদ রানা হাতে নিয়ে শুতে যায় সে।'

'তারপর?'

'পড়তে পড়তে দেশপ্রেমে এমনভাবে অনুপ্রাণিত হয় সে যে, সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পরদিন সকালে ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাকশনে। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে একা দশজন শত্রুসৈন্যকে খতম করে সে।'

আরিফের মুখ সহসা ম্লান হয়ে গেল। তার চেষ্টাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়ল আইরিনের চোখে।

'কি ভাবছেন আপনি?'

'কিছু না। যা বলছিলাম, জেমস্ বণ্ড হওয়া কিন্তু আমার ভাগ্যে আর হলো না।'

'কি জুটল তবে?'

'প্রায় কিছুই না।'

'তার মানে? আপনি কিছুই করেন না? কোন না কোন পেশায় তো নিশ্চয়ই আছেন!'

আরিফ এ প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি এড়িয়ে গেল। বলল, 'আপাতত একদম বেকার।'

'কি ধরনের চাকরি খুঁজছেন আপনি?' অনুসন্ধানী স্বরে জিজ্ঞেস করল আইরিন।

এমনভাবে দুই হাত তুলে দশটা আঙুল সে তার আর আইরিনের মাঝখানে রাখল, যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে অন্য পক্ষের আক্রমণ থেকে।

'মিস তামান্না, ছুটি উপভোগের সময় পেশা বা কাজের কথা না ওঠানোই ভাল। আপনি যেমন চাইবেন না, আমি আপনার বস্-এর কথা, টাইপিং, শর্টহ্যাণ্ড কিংবা ফাইলিং-এর প্রশ্ন তুলে আপনাকে বিব্রত করি, তেমনি আমারও ভাল লাগবে না আমার পেশা বা কাজের কথা। আর জীবিকার জন্যে আমাদের এই যে পেশা, এর বাইরেও আমাদের জীবন অনেক বড়। সেখানে অনেক সমস্যা আছে, অনেক সম্ভাবনাও আছে। ছুটির গল্প সেই-সব নিয়ে। আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে।'

চোখ বড় বড় করে আইরিন বলল, 'আপনি কবি? দার্শনিক? এত কঠিন কথা কি চমৎকার, সহজ ভাষায় বলতে পারেন। তাহলে আগেই বলে রাখছি, আমার সঙ্গে পথে হাঁটতে বোর ফিল করবেন। আমার মাথায় এসব খেলে না।'

'আপনার মাথায় আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ আপনার রোমান্টিক চোখজোড়ায়। আমার জানতে সাধ হচ্ছে, ঐ চোখের পেছনে কিসের খেলা? কোন ভাবনা তার উজ্জ্বল তারায়, পাপড়িতে?'

লোকটির কথা বলার ক্ষমতা অসাধারণ, আইরিন আবার স্বীকার করল। বলল, 'যদি বলি, কিছুই না, হতাশ হবেন, তাই না?'

'হতাশ হব না। কারণ সেটা আমি বিশ্বাসই করব না। ভাল

কথা, দুপুরে খাবেন কোথায় ? এখানকার কয়েকটা রেস্তোরাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। তার একটিতে যাবেন ? তারা অ্যাকুয়ারিয়ামে নানা ধরনের জ্যান্ত মাছ রাখে। খরিদ্দার যেটা পছন্দ করে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে রান্না করে পরিবেশন করে।'

'ওয়াণ্ডারফুল ! কোথায় সেটা ?'

'টেকনাফ রোডে। এখান থেকে তিন কিলোমিটার। আধঘণ্টা লাগবে রিকসায় যেতে।'

'অতদূরে যাবেন ? কেবলমাত্র খাওয়ার জন্যে ?'

'কেন নয় ?'

'বিশ্বাস করি না।'

'কেন ? অবিশ্বাস করছেন কেন আমাকে ?'

'কেন করব না ? আমার চোখ রোমান্টিক কিনা তা জানি না। কিন্তু আপনার কথাগুলো রোমান্টিক, বিলক্ষণ জানি। যে এত রোমান্টিক কথা বলতে পারে, সে কেবল খাওয়ার জন্যে অতদূর যাবে, কি করে বিশ্বাস করি, বলুন ?'

হাসল আরিফ। 'হার মানছি। কথায় আপনিও কম যান না। তাহলে সত্যি কথাই বলি, আপনার সঙ্গে যাবার লোভটাই আসল। যাবেন ?'

'যাব, তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

চোখ বুজে ঘাড় নিচু করে আরিফ বলল, 'বলুন।' যেন বলি হবার জন্য আত্মসমর্পণ করল সে।

'আমার মত সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গলাভ আপনার এত কাম্য হয়ে উঠল কেন ?'

ঘাড় উঠিয়ে আইরিনের দিকে তাকাল আরিফ। বলল, 'আপনি সাধারণ নন, তামান্না, আপনি অসাধারণ। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি পৃথিবীর বাহান্নটি দেশ ঘুরেছি। আপনার মত অনন্য বৈশিষ্ট্য কোন মেয়ের মধ্যে দেখিনি। আপনার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে, আপনি তা জানেন না।'

উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ল আইরিন। 'যাহ্, আপনি ফ্ল্যাটারিং করছেন।'

'মাফ করবেন, মিস তামান্না, ওটা পারি না। পারলে এই তেত্রিশ বছর বয়সে তেত্রিশটার বেশি প্রেম করতে পারতাম।'

আঙুলের ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডেকে বিশ টাকার নোট তার হাতে দিল আরিফ। তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

আইরিন ঘড়ি দেখল। 'এখনই?'

'চলুন না, কিছুদূর হাঁটব, কিছুদূর রিকসায় যাব। পথে একটা মন্দির আছে দেখে নেব ওটা।'

বৌদ্ধমন্দিরের সামনে একটা দোকানে ঢুকে চমৎকার একটা বুদ্ধমূর্তি কিনল আরিফ। সেটা আইরিনের হাতে দিয়ে বলল, 'পছন্দ হয়?'

ইতস্তত করছিল আইরিন। উপহার বলে নয়, দামের জন্যে। একজন বেকার লোক, উপরন্তু বিদেশী, তার কাছ থেকে এত দামী উপহার নেয়াটা কি ঠিক হবে? কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলে খুবই অসন্তুষ্ট হবে লোকটা।

ধমকের সুরে বলল আরিফ, 'দ্বিধা করছেন কেন? বেকার হতে পারি, কিন্তু আপনার মত অনন্যসাধারণ মহিলার সঙ্গলাভের

বিনিময়ে ন্যূনতম সৌজন্য দেখাবার সামর্থ্য আছে আমার, বিলিভ মি।'

প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির দেখা শেষ করে রিকসা নিল আরিফ। 'উঠুন।'

আইরিনের সঙ্কোচ কাটছিল না।

'ঘাবড়াবেন না, তামান্না, আমি অন্য একটা রিকসায় উঠছি।'

'না, না, তার দরকার নেই।' উঠে বসল সে। আরিফ তার পাশে উঠে বলল, 'সোজা চালাও।'

পথে আরও কয়েকটা প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি চোখে পড়ল। রিকসা থামিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। রেস্তোরাঁর সামনে পৌঁছে রিকসা ভাড়া দেবার জন্যে ব্যাগ খুলেছে আইরিন। তার আগেই ভাড়া শোধ করে আরিফ বলল, 'চলুন, তামান্না, খিদে পেয়েছে।'

আইরিন বিরস মুখে বলল, 'আপনার সঙ্গে ঘোরা কঠিন হয়ে পড়ছে।'

'কেন?' কৃত্রিম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আরিফ বলল, 'পথের মাটি রোদ লেগে কঠিন হয়েছে। আমি কি করলাম?'

'আরিফ সাহেব, আমিও ছুটি কাটাতে এসেছি। তার জন্যে টাকা-পয়সাও এনেছি। সেগুলো খরচ করার সুযোগ আমাকে দেয়া উচিত। এই যে খেতে এসেছি, এর বিল দেবার জন্যেও হাত বাড়াবেন নাকি আগেভাগে?'

'ও, শিওর!'

'মাফ করবেন। খাচ্ছি না তাহলে আপনার সঙ্গে।'

'দু'জনে একসঙ্গে এসে আলাদা আলাদা খেতে বসলে লোকে খারাপ বলবে। বিলের কথা এখনই উঠছে কেন?'

'সব খরচ আপনি একা করে আমাকে অপমান করছেন।'

'আমি অপমান করছি না, তামান্না, শুধু শুধু আপনিই এটাকে অপমান মনে করছেন। আপনি পুরুষ এবং আমি মহিলা হলে আপনিও আমাকে বিল শোধ করার সুযোগ দিতেন না।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনার ভদ্রতা-সৌজন্য বোধ দেখে।'

খাওয়াটা সত্যিই চমৎকার। বেশি খাবে না স্থির করেও কিছুটা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলল আইরিন। সে শেষ করার আগেই দেখল, ওয়েটার বিল দিয়ে গেছে এবং ঝটপট রুমালে হাত মুছে আরিফ ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে সেটা। এক পলকে কাগজের টুকরোটা দেখল আইরিন। দু'শো চল্লিশ টাকা।

আড়াইশো টাকা প্লেটে রেখে ওয়েটারকে বিদায় করল সে।

'একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতে দিন দয়া করে,' বিনয়ের সঙ্গে বলল আইরিন, 'বলেছেন, বেকার মানুষ। আবার বিদেশী। ঝোঁকের মাথায় এত টাকা হুড়দাড় করে খরচ করে শেষে যদি ছুটি উপভোগ শর্টকাট করতে বাধ্য হন, তখন আমার দোষ দেবেন না।'

মনোযোগ দিয়ে শুনে উত্তর দিল আরিফ, 'পাঁচ ঘণ্টা একটা মানুষকে এত কাছ থেকে দেখে তার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করার মত বুদ্ধি আপনার আছে, আমার বিশ্বাস। কিন্তু সেটা কাজে না লাগিয়ে আপনি স্রেফ মেয়েলি বুদ্ধিতে আমাকে বিচার

করেছেন, এবং আমার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আপনি।'

'রাগ করলেন?'

'না।'

'তাহলে বলুন, আমার সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছে আপনার এ পর্যন্ত?'

'জানি না, তবে আপনার চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য বলয়ের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। সে বলয় আপনার নিজের সৃষ্টি, না আমার দেখার ভুল, তাও বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে দেবেন দয়া করে?'

'প্রশ্ন করুন।'

'কেন নিজেকে বন্দী করে রেখেছেন বৃত্তের মধ্যে? কেন এত শক্ত দেয়াল তুলেছেন?'

একটু ভাবল আইরিন। চোখ তুলে সোজাসুজি তাকাল বিদেশীর চোখে। বলল, 'যাতে আর দুঃখ এসে আঘাত করতে না পারে।'

এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে রইল আরিফ। ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে দুঃখ পেয়েছেন! এ রকমই অনুমান করেছিলাম।'

পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে। হালকা করার চেষ্টায় আইরিন বলল, 'এসব অনেক পুরোনো কথা। এখন ভেবে লাভ নেই। দুঃখটা আমার মধ্যে অদ্ভুত এক চাওয়ার জন্ম দিয়েছে, যা কোনদিন মিটবে না।'

'ভালবাসা?' গাঢ়স্বরে জানতে চাইল আরিফ। ব্যাগ হাতে

উঠে পড়ল আইরিন। বলল, 'বলব না।'

'দরকার নেই। আমি জানি। থট রিডার না হলেও বলতে পারি, আপনি ভাবছেন···'

'প্লিজ, বলবেন না।'

সে কথায় কান না দিয়ে আইরিনের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে আরিফ বলল, 'দেয়ালটা আপনার চারপাশে সমান শক্ত কিনা, জানি না, কিন্তু আমার দিকে নিশ্চয়ই খুব দুর্ভেদ্য করে রেখেছেন। তার কারণ, আমাকে ভয় পাচ্ছেন আপনি।'

'কিসের ভয়?' মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল আইরিন।

'ধরা পড়ে যাবার ভয়। আমি আপনাকে খুব দ্রুত বুঝতে পারছি।'

কাঁপাকাঁপা গলায় বলল আইরিন, 'কি বুঝতে পেরেছেন?'

'সফিস্টিকেশন আর কাঠিন্যের আড়ালে আপনি আসলে অতি নরম আর স্পর্শকাতর হৃদয় লালন করেন। আপনি পৃথিবীর সব সুন্দর জিনিসে বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর মানুষের যে অভিন্ন চাওয়া, আপনারও চাওয়া তা-ই। কিন্তু যে কারণেই হোক, আপনার বহিরাবরণ তা আপনাকে ব্যক্ত করতে দেয় না। সব মানুষই ভালবাসা চায়। কিন্তু আপনি চান অনেক বড়, অনেক গভীর ভালবাসা, যা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। অন্তরের অন্তস্তলে অপূর্ব এক ইন্ধন নিয়ে ভালবাসার প্রকাণ্ড কোন অগ্নিকাণ্ডের অপেক্ষায় আছেন। হয়ত সে আগুনে পুড়ে আপনি অ-ধরাকে ধরতে পারবেন। আপনার সমস্ত গরল মন্থন করে ভালবাসার অমৃত তুলে আনবে সে আগুন।'

আরিফের কণ্ঠস্বর হিপনোটিক হয়ে উঠছে। আইরিন সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'থামুন!' আর্তনাদ করল সে। 'খুব বেশি কল্পনাশক্তি আপনার!'

আরিফ দেখল, তার মুখ সমুদ্রের ফেনার মত সাদা হয়ে উঠেছে। আলতো করে আইরিনের হাত ধরল সে। 'আমি তোমায় আঘাত করতে চাইনি।'

আইরিন অনুভব করল, তার বিশ্বাসঘাতক শরীর, মন প্রায় সম্পূর্ণ অচেনা দূর দ্বীপবাসী পুরুষের একটুকু ছোঁয়া আর 'তুমি' সম্বোধনে আহ্লাদিত, শিহরিত হয়ে উঠেছে।

'অনেক বেড়িয়েছি। এখন হোটেলে ফিরব।' বলল সে।

অমোঘ বাণীর মত উচ্চারণ করল আরিফ, 'জীবন থেকে পালাতে চেয়ো না, লক্ষ্মী মেয়ে, কোন লাভ নেই।'

'ক্লান্ত লাগছে। চলুন, ফেরা যাক।'

একটা ট্যাকসি ডেকে উঠে পড়ল আইরিন। আরিফ দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। আইরিন ফিরে তাকাল না তার দিকে। ড্রাইভারকে বলল, 'হোটেল হাওয়াই।'

সে সবিস্ময়ে দেখল, পথের প্রতিটি প্রাচীন মন্দির, গাছ আর ল্যাম্পপোস্ট উপহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বোধহয় বলছে, 'ভালবাসা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারলে না, মিস আইরিন চৌধুরী, বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী নারী, সুদূর কোন দেশের হিপনোটিজম জানা এক তরুণের কথার ঘায়ে কাহিল হয়ে গেলে। মরেছ তুমি!'

বয়ে গেছে মরতে! কালকেই কেটে পড়ছি কক্সবাজার থেকে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে নাকি আমার? বিড়বিড় করে বলল সে।

'ম্যাডাম, আঁরে খিস্সু খইতে লাইগ গন ন?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

আইরিন বলল, 'না।'

তিন

'ভাল লাগল?'

আরিফের প্রশ্নে মৃদু হাসল আইরিন। সে আরিফের সঙ্গে এক প্রাচীন আরাকান রাজার বাড়ি দেখতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে মোটেলে ঢুকেছিল কফি খেতে। শেষ পর্যন্ত ঢাকায় ফিরে যাওয়া হয়নি। সকালবেলা হোটেলের গেস্টরুমে বসে আইরিনের রুমে স্লিপ পাঠিয়েছে আরিফ। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে তৈরি হয়ে নিতে বলল সে আইরিনকে। আর আইরিন নিশ্চিত, সে তার ডাকের অপেক্ষা করছিল, হয়ত অবচেতনে।

আইরিন বুঝতে পারল না, আরিফ কোনটার কথা জিজ্ঞেস করছে। কি ভাল লাগল? রাজবাড়ি দর্শন? না কফি?

আসলে তার সবই ভাল লাগছে সকাল থেকে। বালুকাবেলা, সকালের সূর্য, রাজবাড়ি, সর্বোপরি সঙ্গের লোকটিকে। জ্ঞানের জাহাজ লোকটা। জানে না, এমন কোন বিষয় নেই বোধহয়। সারা পথ সে তাকে শুনিয়েছে ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, অর্থনীতি, আধু-

নিক বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট, কারিগরি উন্নতি, এমনকি সংস্কৃতির ওপর সারগর্ভ মন্তব্য। বাংলাদেশ তার দেশ নয়, অথচ এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ আর জাতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে ছোটখাট এমন কয়েকটা ব্যাখ্যা হাজির করল যে আইরিনের মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা।

অনেক বিষয় নিয়ে তর্ক করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এড়িয়ে গেছে আইরিন। সে বাংলাদেশের সেরা শিল্পপতি আইরিন চৌধুরী নয়, নিতান্তই তামান্না হক। প্রাইভেট ফার্মের সেক্রেটারি। এত বেশি জানা তার সাজে না। তবু মাঝে মাঝেই বিস্ময় প্রকাশ করল আইরিন।

'মাই গড! এত খবর রাখেন আপনি?'

আলোচনার অনিবার্য গতিধারা ভালবাসা পর্বে এসে ঠেকল। আইরিন বলছিল, 'খুব ভাল লাগল না।'

'স্বাভাবিক,' বলল আরিফ। 'যে ভালবাসতে জানে, তার সবকিছু অত সহজে ভাল লাগে না।'

আইরিন বলল, 'আপনি ভাল লাগা না লাগার ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছেন।'

অভিযোগ গায়ে মাখল না আরিফ। বলল, 'ভাল লাগা না লাগা অবশ্যই খুব সিরিয়াস বিষয়। ভালবাসা আরও সিরিয়াস।'

'ঠিক কি বোঝাতে চান?' সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করল আইরিন।

'বলতে চাচ্ছি,' বলল আরিফ, 'একজন মানব আর একজন মানবীর মধ্যকার ভালবাসা কখনই শান্ত, সমাহিত কোন দীঘির

মতো নয়। বরং তা বেগবান, উন্মত্ত, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত। তার অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য ঢেউয়ের মত।'

আইরিন সেই ছবিটি আবার সামনে পেল। তার টেবিলের অন্য পাশে এক দুর্ধর্ষ পুরুষ। তার পেছনে জানালার কাচে বিকেলের সমুদ্র, ঢেউ এসে ধবল ফেনা হয়ে ভেঙে পড়ছে কূলে। ফিরে যাচ্ছে। আবার আসছে বড় ঢেউয়ের চেহারায়।

'এরকম ভালবাসা পৃথিবীতে নেই, আরিফ সাহেব।' আইরিন বলল।

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আরিফ বলল, 'না, আছে।'

'আছে?'

'তোমার চোখের তারায়, ঠোঁটের আন্দোলনে সেই ভালবাসাকে প্রত্যক্ষ করছি আমি। তুমি স্লিপিং বিউটি। কুঁড়ির আবরণে ঢাকা প্রকাণ্ড গোলাপ।'

আইরিন চপল হাসি রোধ করতে পারল না। 'শুনতে খারাপ লাগছে না কিন্তু!'

হাসির উত্তরে হাসিই আশা করেছিল আইরিন। কিন্তু অন্য পক্ষের গম্ভীর মুখ দেখে নিজের মুখের হাসি নিবিয়ে ফেলল।

'একদিন কেউ একজন আসবে, ফুলকুঁড়ির ঘুম ভাঙাবে।' বলল আরিফ, প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, 'আমি যদি সেই 'একজনটি' হতে পারতাম!'

মুহূর্তের জন্যে আইরিনের হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গিয়েছিল কথাটা শুনে। একবার ভাবল, কথাগুলো ঠিকমত শুনতে পায়নি সে। তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আরিফ, 'ভেরি প্লেইন এণ্ড

সিম্প্‌ল। আমি কেবলমাত্র ছুটির দিনের বন্ধু। ছুটি ফুরিয়ে গেলে তোমার নিজস্ব জীবনে ফিরে যাবে তুমি। কোনদিন কোন সূত্র ধরে স্মৃতির ঝলকানিতে মনে পড়তে পারে, নাও পারে, আমার সঙ্গে তোমার সখ্যতা হয়েছিল। কি, তাই না?'

আইরিন অকপটে উত্তর দিতে পারল না। বলল, 'কি জানি, ভাবিনি ও নিয়ে।'

'হয়ত ঠিক এখানেই আবার কখনও আসবে তুমি। ভাববে, আরিফ কোথায়, কে জানে!'

'এমনভাবে কথা বলছেন, যেন মারা যাচ্ছেন শিগগিরই!' আহত আইরিন কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করল। এ জীবনে বহু পুরুষ তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভালবাসার কথা বলেছে। বলেছে স্থায়ী ভালবাসার কথা, ঘর বাঁধার কথা। যদিও সেগুলোর অধিকাংশ কেবলই মুখের কথা, তবু আশ্বাসের দিক থেকে ছিল অনেক বড়। এই প্রথম একজন তাকে তার ভাললাগার কথা ব্যক্ত করে বলেছে, ছুটি ফুরোলে আর দেখা হবে না।

'না, মরছি না। মরার কোন উপায়ও আমার নেই। আরো ক'টা দিন বাঁচতেই হবে। কিন্তু অন্য একটা বিপদের আশংকা করছি।'

'কি বিপদ?' জানতে চাইল আইরিন।

'তোমাকে বেশি ভাল লেগে যাবার বিপদ। তোমার সঙ্গে যতই ঘুরছি, একটু একটু করে ততই ভাল লাগছে। অপূর্ব তোমার সঙ্গ!'

সে না বললেও আইরিন বুঝতে পারছে। আরিফের চোখে

ভাললাগার কথা।

আরিফ আইরিনের কোমল পেলব একখানা হাত টেনে নিলো নিজের হাতের মধ্যে। বুকের ভেতরে অদ্ভুত শিরশিরানি অনুভব করল আইরিন।

'ভাগ্যে বিশ্বাস করো তুমি?'

'না' বলতে গিয়েও থেমে গেল আইরিন। লোকটার জ্ঞানের পরিধি আরও কতদূর বিস্তৃত, দেখা দরকার।

'হাত দেখতে জান তুমি? বল তো, কি লেখা আছে আমার হাতে?'

আইরিনের গোলাপী করতলে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে আরিফ বলল, 'কি জানতে চাও?'

'যা জান, বল।'

'আমি হাত দেখতে জানি না। শুধু তোমার ভাগ্য বলতে পারি। এক সুদর্শন, ধনী, প্রতিষ্ঠিত লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। আলীশান প্রাসাদ থাকবে তার। চাকর-বাকর-শোফার-দারোয়ানের অভাব নেই। তোমার বরভাগ্য চোখ টাটিয়ে দেবে লোকের। খুশি হলে?'

ছোঁ মেরে হাত সরিয়ে নিল আইরিন। 'তুমি নিষ্ঠুর আচরণ করছ আমার সঙ্গে। পুরো দুই দিন আমার সঙ্গে মিশে এই ধারণা হল তোমার? ঐ জীবন চেয়েছি নাকি আমি?'

'সব মেয়েই ঐ জীবন চায়। নিরাপত্তা, দামী স্বামী, নো দুর্ভাবনা।'

'আমি ঘৃণা করি ঐ জীবনকে,' আইরিনের কণ্ঠস্বর তার নিজের

কানেও অপরিচিত, রূঢ় শোনাল। 'জীবন থেকে আমি বিত্ত আর বিলাস ছাড়াও অনেক বেশি দাবী করি। কি দাবী করি, সম্ভবত তুমি তা কল্পনা করতে পার না।'

'এবার নিষ্ঠুর আচরণ করছ তুমি। কেন বুঝতে পারছ না, তোমার ঐ তথাকথিত স্বামীটিকে ঈর্ষা হচ্ছে আমার, যে তোমাকে ওগুলো দিতে পারে। তাছাড়া এসব তো স্বাভাবিকভাবেই তোমার প্রাপ্য।'

আরিফের কাঁপাকাঁপা গলা আইরিনের বুকে বাজল। 'তাহলে তার কথা বলছ কেন?' বলল সে। 'ঐ রকম স্বামীর তো অস্তিত্বই নেই।'

'নেই, কিন্তু হবে। আমি ভাবতেই পারছি না, তোমার মত একটি মেয়ের এতদিনে বিয়ে হল না কেন! হওয়া উচিত ছিল। বউ হিসেবে তোমার মত মেয়ে যে কোন পুরুষের অনেক সাধনার ধন।'

চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল আরিফ। আইরিনও উঠল। সমুদ্রতটে সন্ধ্যা নেমেছে। একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মার্চের শুরুতেও ফেব্রুয়ারির প্রভাব কাটেনি আবহাওয়ায়। অনেকক্ষণ নীরবে হাঁটল দু'জনে। অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের কল্লোল শুনল।

আইরিনের সব কথা হারিয়ে যাচ্ছে, মুখে এসেও ফিরে যাচ্ছে, সে কি সমুদ্রের গর্জনের জন্যে? সে ভেবে পেল না, তার এমন হচ্ছে কেন?

যে অজ্ঞাতবাস তার দুঃসহ হবে বলে মনে হয়েছিল, সেটা জীব-

নের অনন্য মাধুরিমায় ভরে উঠল। শুধু এই মানুষটির সঙ্গ তার মুহূর্তগুলোকে এত মধুর করে তুলেছে। উপভোগ্য করেছে। কিন্তু সে যে শুধু বিদায়ের কথা বলে! সত্যিই কি চলে যাবে সে? তারপর? এই ভয়ংকর একাকীত্ব নিয়ে কি করবে সে? সমুদ্রের এত ঢেউ, এত অবিরাম গর্জন, বালুবেলার এত ঝিনুক, মোটেলের বিনোদন-কক্ষ, এত মানুষের নৈকট্য, কিছুই কি তার সে নৈসঙ্গের যন্ত্রণা মুছিয়ে দিতে পারবে?

'আরিফ,' কোমল কণ্ঠে ডাকল আইরিন, এভাবে কখনও কাউকে ডাকেনি সে, 'তোমার কথা কিছুই বললে না আমাকে?'

'কি বলব, বলো?' আরিফের গলার স্বর ভারী হয়ে এল, 'ধরে নাও, আমার কোন অতীত নেই, আর ভবিষ্যৎ আমার অজানা।'

'কেন এত হেঁয়ালি করছ? কেন শুরুতেই বিদায়ের বাঁশি বাজাচ্ছ তুমি?'

'বিদায়ের বাঁশি অনেক আগেই বেজেছে, সুন্দরী! আমায় যেতে হবে।'

'কবে?'

'হয়ত কালই।'

'কি বলছ তুমি?' হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারল না আইরিন।

'তোমার ছুটির মেয়াদ যেমন তোমার, আমারটাও তেমনি আমার। আমরা তো কেবল ছুটি উপভোগ করার জন্যে খানিকটা পথ একসঙ্গে হেঁটেছি। এর বেশি কি?'

আইরিন বড়সড় ঝাঁকুনি খেল অন্তরের মধ্যে। ভাললাগার

এই মহামূল্য মানিক সে প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু হঠাৎ পাওয়া এই ধন হারানোর তীব্র বেদনা তাকে সহ্য করতে হবে। নিষ্ঠুর লোক সে!

অনেকক্ষণ চোখের পাতা পড়েনি তার। হঠাৎ পাতা বুজতে গিয়ে আইরিন আবিষ্কার করল, সে কাঁদছে। এ কি করেছে সে? ভালবেসে ফেলেছে সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক পরদেশীকে? এত অল্প সময়ে?

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার মালিক, দেশে-বিদেশে তার প্রণয়প্রত্যাশী, পরিণয়প্রত্যাশী অসংখ্য পুরুষের অনন্ত স্বপ্ন, অনেক মানুষের ঈর্ষা আর শ্রদ্ধার পাত্রী আইরিন চৌধুরী এ কি করল?

চোখ মুছতে গিয়ে ধরা পড়ল সে।

'চোখে কি হয়েছে, তামান্না?'

'কিছু না।'

'কাঁদছ তো? তোমাদের, মেয়েদের নিয়ে এই বিপদ। সহজ-ভাবে সত্যকে গ্রহণ করতে পার না কিছুতেই। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বাণী গ্রহণ করেছ। কিন্তু অন্তরে তার বাণী গ্রহণ করতে পারনি। তিনি বলেছেন, "মনেরে তাই কহ যে, ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে"।'

আরিফ তার বাম হাতে আইরিনের শরীর বেষ্টন করল। ডান হাতে চোখের পানি মুছে দিল। আরিফের শরীরের সঙ্গে আরও নিবিড় হয়ে এল আইরিন। কাঁধে মাথা রাখল।

'তোমার নিজের সম্পর্কে কোন সূত্রই দেবে না আমাকে?

যদি কোনদিন তোমাকে ভুলতে না পেরে অন্তত আর একবার দেখার জন্যে আকুল হয়ে পড়ি ? কোথায় খুঁজব তোমাকে ?'

'আমায় ক্ষমা করতে পার না ? আমি যে সত্যিই অক্ষম আমার সম্পর্কে কিছু বলতে।'

'কিন্তু কেন ?' আরিফের শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল আইরিন।

'ভারি মুশকিলে ফেলেছ তুমি আমাকে। একটা কিছু কল্পনা করে নাও না ! এই ধর, কোন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দলের নেতা, কিংবা কোন আত্মগোপনকারী অপরাধী, জেল পলাতক, অথবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত এজেন্ট…'

'বিশ্বাস করি না। তুমি একজন সুন্দর মানুষ। আমাকে ফাঁকি দিতে পার না। এত চমৎকার হৃদয় যার, সে ওসব কিছু হতে পারে না।'

প্রায় ফিসফিস করে আরিফ বলল, 'সুন্দর হৃদয় তার, যে আমাকে সুন্দর দেখে।'

আইরিনের ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নামিয়ে আনল আরিফ। আইরিন তার নাকের কাছে পুরুষের তপ্ত নিঃশ্বাসের ছোঁয়া অনুভব করল। তারপর অনুভব করল, বেদখল হয়ে গেছে তার সযত্ন-রক্ষিত কুমারী অধরোষ্ঠ। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকল। ক্রমশ পুরুষের নিবিড় অন্বেষণের মুখে একটি একটি করে ধরা দিল তার মুখগহ্বরের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি পেশী।

দীর্ঘক্ষণ পর মুখ সরিয়ে নিয়ে আরিফ বলল, 'চল, তোমাকে হোটেলে রেখে আসি।'

একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আইরিনকে তুলে দিল সে। নিজে

উঠে বসতে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে বীচ। সেখানে কি দেখছে সে? উঠে বসার সময় অন্যমনস্ক দেখাল তাকে।

'আরিফ, একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'নতুন কোন প্রশ্ন হলে দেব।'

'তুমি বিবাহিত?'

'না।'

গাড়ি হোটেল হাওয়াই-এর কারপার্কে থামতেই দ্রুত নেমে পড়ল আরিফ। ঘুরে চারদিক দেখে নিয়ে আইরিনের দিকের দরজা খুলল।

'এসো। তাড়াতাড়ি চল, লক্ষ্মীটি, আমার তাড়া আছে।'

করিডর দিয়ে আরিফের কাছ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে আইরিন বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হয়, কোথাও মস্ত একটা বাধা আছে, সেটা অতিক্রম করা যায় কিনা জানার সুযোগ পেলাম না। কিন্তু তুমি চলে যেতে চাও কার স্বার্থে? তোমার, না আমার?'

'যদি ডিজঅনেস্ট হতাম, বলতাম, তোমার জন্যে। কিন্তু যদি সত্যি উত্তরটা শুনতে চাও, বলি, আমার নিজের স্বার্থে। তোমাকে ভালবাসার সাহস নেই আমার। আর কিছু জিজ্ঞেস কর না, তামান্না, উত্তর দিতে পারব না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকল আইরিন।

কোথায় গেল তোমার এত গর্ব, আইরিন? চুপিসারে নিজেকে জিজ্ঞেস করল সে, 'এই যে আরিফ, পথে দেখা-হওয়া মানুষটা,

চালচুলোহীন হয়তো বা, অতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, সে তোমাকে চায় না। এত ধন-সম্পদ, ব্যবসা, শিল্প দিয়ে কি করবে তুমি?'

প্রায় ধমকের সুরে বলল আরিফ, 'টেক ইট ইজি, তামান্না, তোমার সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল আমার। তুমি এত সহজে ভেঙে পড়বে জানলে আমি আমার ছুটি নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই কাটাতাম।'

'কিছুতেই ভাবতে পারছি না,' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল আইরিন, 'আমাদের আর দেখা হবে না।'

তার কাঁধে হাত দিয়ে আরিফ গ্রিলের পাশে দাঁড়াল। 'ঐ যে সাগর, দেখতে পাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'ঐ ভেসে যাওয়া আলোটা?'

'দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটাই আমি। আকাশে হঠাৎ উড়ে যাওয়া একটা পাখির মত। কিংবা গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেয়া কোন স্বপ্নের মত। বোকামি হবে তাদের কাউকে কখনও আবার পাবার আশা করলে।'

'কেন আশা করব না, বলতে পার?' ধীরে ধীরে বলল আইরিন, স্বগতোক্তির মত করে। 'তোমার মন কি দিয়ে তৈরি? আমার সত্তার একটি আঁচড়ও তাতে পড়ল না। কিসের বাধা তোমার?'

এক মিনিট চুপচাপ ভাবল আরিফ। বলল, 'ভেবেছিলাম,

কিছুই বলব না। তুমি বাধ্য করছ। আমি তোমাকে···তোমাকে··· ভালবেসে ফেলেছি। আরও যতটা সময় তোমার সান্নিধ্যে থাকব, ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে। এই ঝুঁকি আর নিতে পারছি না আমি। আমার জীবন খুবই বিপজ্জনক। তোমার মত ফুলকে সে জীবনের সঙ্গে জড়ান যায় না।'

আর্তনাদের স্বরে আইরিন বলল, 'কেন?'

'এত বিপদ, এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না তুমি। আমাকে অবিবেচক হতে বল না।'

হতাশায় ভেঙে পড়ল আইরিন। ভুল হয়েছে তার ভালবাসায়। কোন আশা নেই। চলেই যাবে লোকটি।

ওরা লিফটের কাছে পৌছুল।

'এই তবে শেষ দেখা?' কান্নাভেজা গলায় জিজ্ঞেস করল আইরিন।

'হ্যাঁ। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমার ছুটি পরম পাওয়ায় ভরিয়ে দিয়েছ তুমি।'

উদগত অশ্রু রোধ করার জন্যে মাটির দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আইরিন। সহসা এক ধরনের পরিবর্তন অনুভব করল সে। বজ্রমুঠিতে ওর হাত প্রায় অবশ করে ফেলেছে আরিফ। রীতিমত কাঁপছে সে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। আরিফ হোটেলের অ্যাপ্রোচওয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে ওকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল লিফটে।

লিফট-বয়কে গম্ভীর স্বরে আদেশ করল, 'দরজা বন্ধ কর। কুইক! ওপরে চল।'

'কোন ফ্লোর ?' জিজ্ঞেস করল লিফটবয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় আইরিন ভুলে গিয়েছিল, উত্তরটা তাকেই দিতে হবে। হাতে আরিফের হাতের চাপ অনুভব করে সংবিৎ ফিরে পেল সে।

'থার্ড ফ্লোর।'

ছয় সেকেণ্ড সময় কাটল যেন ছয় বছর ধরে। লিফ্‌ট থেকে নেমে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল আরিফ, 'কোনদিকে ?'

আইরিনের রুমের সামনে পৌঁছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল সে দুই-দিকে। আইরিন ব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলতে গেল। চাবি কেড়ে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে কী হোলে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলল আরিফ। তারপর এক ধাক্কায় আইরিনকে রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়লো। দরজা লক করে সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা নিঃশ্বাস নিল।

'কি হয়েছে ?' উৎকণ্ঠায় অধীর প্রশ্ন আইরিনের।

'কয়েকটা লোক ঢুকে পড়েছে হোটেলে। বীচ থেকেই সম্ভবত অনুসরণ করছিল। আমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা জানি না। যদি দেখতে পায়, কিংবা সন্দেহ করে থাকে, নিশ্চয়ই লিফ্‌ট-বয়কে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কোন রুমে এসেছি।' হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ করল আরিফ।

সামনে থেকে আইরিনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জানালার কাছে গেল সে। সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে জানালার পর্দা তুলে ঘাড় যতটা সম্ভব বাঁকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল নিচে নামার কোন পথ আছে কিনা।

'তোমার সঙ্গে আসা একদম উচিত হয়নি,' ফিসফিস করে বললো আরিফ, 'স্রেফ পাগলামি হয়ে গেছে। তোমাকে লিফটে তুলে দিয়ে অন্য রাস্তা খুঁজে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল আমার। বেকুব আমি। তোমাকে জড়াতে চাইনি এসবের মধ্যে।'

'কিসের মধ্যে?' আইরিন ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কাঁধে হাত রেখে। 'ওরা কারা? কেন পিছু নিয়েছে তোমার?'

'বলতে পারবো না, সোনা,' মিনতিভরা চোখ আইরিনের চোখে ফিরিয়ে আরিফ বলল, 'একান্ত গোপনীয় ব্যাপার। কোন একটা বুদ্ধি বাতলে দাও, কিভাবে পালাব, প্লিজ—'

'সত্যিই কঠিন বিপদ তোমার? ওরা সাংঘাতিক কোন ক্ষতি করতে পারে?'

'হুঁ।'

'তাহলে এখানেই থাক। এই রুম আমার। একজন ভদ্রমহিলার একার। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'কক্ষনো না,' প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল আরিফ। 'ইতোমধ্যে যথেষ্ট বোকামি করে ফেলেছি। আর নয়।'

দরজার দিকে এগুল সে। আইরিন ছুটে এসে পথ রোধ করল। 'যেয়ো না, আরিফ!'

আরিফ জড়িয়ে ধরল আইরিনকে। গালে গাল ছুঁইয়ে বলল, 'তুমি ভাল থেক, সোনামণি, সাবধানে থেক। আমি চিরদিন মনে রাখব তোমায়।'

আইরিনের কপালে তিনটা চুমু খেয়ে দরজার নব-এ হাত দিল আরিফ। ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা দু'জন। আবার টোকা পড়ল। আইরিন আরিফের ইশারা পেয়ে বলল, 'কে?' স্তব্ধতার মধ্যে তার তীক্ষ্ণ স্বর ভয়ংকর মনে হল।

ওদিক থেকে বিদেশী উচ্চারণে ভাঙাভাঙা বাংলায় পুরুষকণ্ঠ কথা বলল। 'ম্যাডাম, দয়া করিয়া দরজা খুলবেন?'

পা টিপে টিপে জানালার কাছে গিয়ে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলল আইরিন। হ্যাঙার সরিয়ে জায়গা করল। গুঁড়ি মেরে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল আরিফ। নিঃশব্দে ওয়ার্ডরোবের দরজাটা বন্ধ করে আইরিন রুমের দরজার কাছে সরে এল।

মৃদু টোকা ততক্ষণে ধাক্কায় রূপান্তরিত হয়েছে। একটানে দরজা খুলে চোখে মহা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে আইরিন বলল, 'কি ব্যাপার? আই'ম গোয়িং টু বেড।'

দু'জন ভয়ংকরদর্শন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। ভীষণ মোটা, জবরজং রঙের কাপড় পরা। চোখে সানগ্লাস। একজনের হাতে ভারী ব্যাগ একটা। অন্যজনের হাতে চার ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

'ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। আপনার বিরক্ত লাগিল। আপনার রুম সার্চ করিব।'

'কেন?' ধমকের সুরে বলল আইরিন।

'দরকার আছে।'

স্পষ্ট বুঝতে পারল আইরিন, সে দরজা থেকে সরে যাওয়া-

মাত্রই লোক দু'জন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ঘরে। তল্লাশি শুরু করবে। তারা ইতোমধ্যেই তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের ভেতরটা দেখতে শুরু করেছে।

'আপনারা কারা?' আইরিন তার নিজস্ব মেজাজে ফিরে গেল মুহূর্তে। শ্রমিক, সুপার ভাইজার, অফিসার আর ম্যানেজার মিলিয়ে অন্তত চল্লিশ হাজার লোকের ওপর সরাসরি হুকুমদারি করার অভ্যাস আছে তার।

'আমরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পথ ছাড়িয়া দেন।'

'আপনাদের কার্ড দেখান আমাকে। এবং প্রমাণ করুন, আমার রুম সার্চ করার অধিকার আছে আপনাদের।'

'দেখুন, ম্যাডাম, আপনি ফর নাথিং টাইম নষ্ট করিতেছেন।'

'ও, ইউ শাটআপ!' চেঁচিয়ে উঠল আইরিন। তারপর করিডরের শেষ মাথায় একজন বেলবয়কে দেখতে পেয়ে গলায় স্বর চড়িয়ে ডাকল আইরিন, 'অ্যাই, বয়, কাম হিয়ার!'

বেলবয়টি নতুন একজন বোর্ডারকে রুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। নারীকণ্ঠের ডাক শুনে দ্রুত এগিয়ে এল।

'তোমাদের হোটেলে এত আজগুবি উপদ্রব কেন? এই লোকগুলো নিজেদের গোয়েন্দা বলে দাবি করছে। তারা আমার রুম সার্চ করতে চায়। তোমাদের ম্যানেজারকে ডাক। তাছাড়া পনের নম্বরে ব্রিগেডিয়ার আজিম আছেন, কাউন্টারের লিস্টে দেখলাম। তাঁকেও আমার সালাম দিয়ে আসতে বল। আমি জানতে চাই, এরা কোন এলাকায়, কোন স্কোয়াডে, কোন অফিসারের আণ্ডারে ডিউটি করছে।' হোটেলরুমে ভদ্রমহিলাকে

ডিসটার্ব করার সাহস এরা কোথায় পেয়েছে ?'

বেলবয় তাদেরকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে খুব নিচু স্বরে কথাবার্তা বলল মিনিটখানেক।

লোক দু'জন ফিরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়াল।

ব্যাগওয়ালা লোকটি বলল, 'ম্যাডাম, মাফ করিয়া দেন। ভুল হইয়াছে। বস্, নিচের তলায় খুঁজিতে হইবে।'

লোক দু'জন দ্রুত হেঁটে লিফটের দিকে চলে গেল। বেলবয়কে ডেকে বলল আইরিন, 'ওদের দিকে লক্ষ্য রেখ। এসব ঝামেলা হলে লোকে তোমাদের হোটেলে ওঠা ছেড়ে দেবে।'

হাত কচলাল বেলবয়। 'কি করব, ম্যাডাম ? শান্তিবাহিনীর উৎপাত শুরু হওয়ার পর থেকেই এইসব শুরু হয়েছে। অনেক আজেবাজে লোকও গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে নিরীহ বোর্ডারদের ওপর চড়াও হয়।'

বেলবয় চলে যেতেই রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আইরিন। আরিফ বেরিয়ে এল।

'মাই গশ্! একহাত দেখালে তুমি! কিন্তু আর এক মিনিটও এখানে নয়। চল, বেরিয়ে পড়ি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই এলাকা ছাড়তে হবে আমাদের।'

চোখ কপালে তুলল আইরিন। 'এলাকা ছাড়তে হবে! আমাদের! বলছ কি তুমি ?'

'প্লিজ, তাড়াতাড়ি কর!'

'তাড়াতাড়ি কর মানে ? লোকগুলো তো চলে গেল।'

'ওরা যায়নি, তামান্না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে

তোমাকেও রেহাই দেবে না ওরা। ভাবতেই পারছি না, কি ক্ষতি করবে! ঐ ছোট ব্যাগে দু'চারটে জরুরী জিনিস নিয়ে নাও। লক্ষ্মীসোনা, দেরি কর না।'

সম্মোহিতের মত নির্দেশ পালন করল আইরিন। 'কিন্তু··· তোমার সঙ্গে···কোথায় নিয়ে যাবে তুমি আমাকে?'

'দূরে কোথাও। আপাতত চট্টগ্রাম।'

ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে বলল আইরিন, 'ওরা সত্যিই এত ভয়ংকর?'

'কত ভয়ংকর, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। হারি আপ! সময় নেই।'

আরিফের ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা আইরিনের মধ্যেও সংক্রমিত হল। সে অনুভব করল, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। ভয়ে, না উত্তেজনায়, ঠিক বুঝতে পারল না।

রুম ছেড়ে বেরিয়ে লিফটের পথ ধরতেই বাধা পেল আইরিন।

'সামনের পথ আমাদের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, তামান্না। পেছনের পথে চল।'

'পেছনের পথ মানে?'

'কর্মচারীদের ওঠানামার জন্যে পেছনে সিঁড়ি আছে। কুইক! ব্যাগ আমার হাতে দাও।'

আইরিন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, পেছনের সিঁড়ির খবর সে জানল কেমন করে, কিন্তু সুযোগ পেল না। দ্রুত এগিয়ে গেছে আরিফ। অতি কষ্টে তার নাগাল পেল আইরিন।

হোটেলের পেছনটা রীতিমত অন্ধকার। নিরাপদ বোধ করল

আইরিন। আরিফ চারদিকে সতর্ক চোখ বুলিয়ে গলির পথ ধরল। ভাঙা একটা দেয়াল অতিকষ্টে পার হল আইরিন। অথচ আরিফ অনায়াসে সেটা পার হয়ে তার হাত ধরে বড় রাস্তায় উঠল।

একটা ট্যাকসি পাওয়া গেল সামনেই।

'চট্টগ্রাম যাবে?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল আরিফ।

নির্বিকার মুখে চুরুট খাচ্ছে ড্রাইভার। যেন যাবার কোন ইচ্ছে নেই তার।

'পাঁচ শ টাকা বখশিস পাবে। ডাবল ভাড়া। রাজি?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ড্রাইভার। মালদার পার্টি পেয়েছে। 'মোট দু'হাজার দিবেন, স্যার। বুঝেন তো, ফিরতি ভাড়া পাব না।'

'তা-ই পাবে।'

তিন ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম পৌঁছোল তারা। ড্রাইভারের মুখেই জানল, রাত সাড়ে এগারোটায় ট্রেন আছে। ঘড়ি দেখল আরিফ। তিন মিনিট বাকি।

কাউন্টারে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দু'টো ফার্স্ট ক্লাস। সিলেট।'

টিকেট নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল, গার্ড সবুজ বাতি দোলাচ্ছে। অ্যাটেনডেন্ট দরজা বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে তুলে নিল ওদের।

'কত নম্বর?' অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করল।

'ঘ-পাঁচ আর ছয়।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আরিফ।

চার

জানালার পেছনের অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে আইরিন বলল, 'এখন নিরাপদ নই আমরা?'

আইরিনের কাঁধে হাত রেখে দূরের অপসৃয়মান গাছ-গাছালির কালো মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল আরিফ। 'কি জানি,' বলল সে, 'নিঃসংশয় হতে পারছি কই?'

'বীচে ওদের দেখেছিলে তুমি?'

'সম্ভবত।'

'হোটেল পর্যন্ত তারা আমাদের অনুসরণ করেছে। আমরা বুঝতে পারিনি।'

'কে জানে, এই ট্রেন পর্যন্ত অনুসরণ করে আমাদেরই সফর-সঙ্গী হিসেবে যাচ্ছে কিনা। সেরকম সম্ভাবনা খুবই আছে।'

'আহ্, আরিফ,' মৃদু ধমক দিল আইরিন। 'খামকা দুশ্চিন্তা করছ। আমরা যেভাবে চোরাপথ দিয়ে নেমে গলি পার হয়ে অন্ধকারে স্টেশনে পৌঁছেছি, তাতে কাকপক্ষীরও টের পাবার কথা নয়। আর ঐ 'ওরা,' তুমি যাদের নাম উচ্চারণ করতে চাও

না, যদি পিছু নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত এসেও থাকে, নির্ঘাত ট্রেন মিস করেছে। স্টেশনে আমরাই এ ট্রেনের সর্বশেষ প্যাসেঞ্জার। মেনে নিচ্ছ?'

'নিচ্ছি।' আইরিনের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আরিফ বলল। কিন্তু আইরিন বুঝতে পারল, খুব দ্রুত চিন্তা করছে সে। ধীরে ধীরে বলল আরিফ, 'কিন্তু নিশ্চিন্ত হব কেমন করে? আমরা যা দেখতে পাই আর জানি, তার বাইরে অনেক বড় বড় সত্য রয়েছে। এত সহজেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?'

আইরিন বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এতবড় এক্সপ্রেস ট্রেনে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে বলে মনে কর?'

'যদি সত্যিই ওরা এই ট্রেনে থাকে, তন্নতন্ন করে খুঁজবে আমাদের। এক ইঞ্চি জায়গাও বাকি রাখবে না। বুঝতে পারছ না, তাই না?'

'কি করে বুঝব? তুমি তো কিছুই বলছ না। প্লিজ, আরিফ, সব খুলে বল আমাকে। দেখ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি। হোটেলের রুমে আমার সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি। এতবড় কমপ্লিমেন্ট কোন মেয়ে কাউকে দিয়েছে বলে শুনেছ কখনও?'

আরিফ আইরিনের কাঁধে হাত রাখল। 'শুধু তা-ই নয়, এমন একজনের সঙ্গে এসেছ, দু'দিন আগে যাকে তুমি চোখেও দেখনি।'

হঠাৎ তিথির কথা মনে পড়ল আইরিনের। যখন জানবে, কি যে দুর্ভাবনায় পড়বে। কাউকে বলতে পারবে না, অথচ বুঝেও

উঠতে পারবে না, তার কি করা দরকার। কিন্তু এই লোকটিকে সে বিশ্বাস করে। যদিও আত্মপরিচয় গোপন রেখেছে সে। চারপাশে যে সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো সম্পর্কেও তার নীরবতা রহস্যময়। কিন্তু যা-ই ঘটুক, লোকটিকে খারাপ বলে ভাবতে মন সায় দিচ্ছে না। সে ভাল লোক।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল আরিফ।

'তুমি বস, তামান্না, আমি একটু ঘুরে আসি।'

'না!' আর্তনাদের সুরে বলল আইরিন। 'সত্যিই যদি ওরা আশেপাশে থাকে? আমাকে একা ফেলে যেয়ো না। কোন কারণে তোমার ফিরতে দেরি হলে আমার কি অবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ? কোথায় খুঁজে বেড়াব তখন তোমাকে?'

কিন্তু আরিফের মুখের দিকে তাকিয়ে আইরিন নিশ্চিত বুঝতে পারল, সে যাবেই। আইরিন আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় বন্ধ দরজা খুলে গেল। সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল আরিফ, এক সেকেণ্ডের পাঁচভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে। আইরিন তার মুখে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য প্রস্তুতির চিহ্ন দেখতে পেল। যথা-সাধ্য চেষ্টা করেও সে নিজে অস্ফুট আর্তনাদ গোপন করতে পারল না।

অ্যাশকালার ট্রপিক্যাল স্যুট পরা এক ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখা গেল। হাতে কালো ব্রিফকেস। খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন, তাকে দেখে মনে হল।

'কি চান?' আরিফের স্বরে রুক্ষতা স্পষ্ট।

'মাফ করবেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। ভেবেছিলাম, এ

কামরাটা খালি আছে।'

আইরিন আরিফের দিকে তাকাল। আরিফ কিছু বলছে না দেখে বিস্ময় জাগল ওর মনে। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'এখন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন···'

তাকে বাধা দিয়ে আরিফ বলল, আপনার সমস্যাটা কি?'

'দেখুন,' ভদ্রলোক বিব্রতভাব কাটাবার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। 'আমার সঙ্গে মহিলা আছেন। দু'টো টিকেট পেয়েছি ফার্স্ট ক্লাসের। কিন্তু কণ্ডাক্টর বলছে, খালি রুম নেই। অন্য দু'জনের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। আমার স্ত্রীর ঘোর আপত্তি তাতে। 'গ' কামরায় দুটো সিটই শুধু খালি আছে। কিন্তু সেখানে উনি বসতে চাচ্ছেন না। তাই খুঁজতে বেরিয়েছি, অন্য কোথাও কোন ভাল ব্যবস্থা করা যায় কি না। এনিওয়ে, আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

মাথা নুইয়ে সালাম দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। আরিফ তাকে ফেরাল। 'শুনুন, কথা আছে।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। আরিফ তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করে বলল, 'আপনার সঙ্গিনী কোথায়?'

''গ' কম্পার্টমেন্টে অপেক্ষা করছেন।' আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক।

'দেখুন, অকুপাই করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এই কামরার দরকার নেই আমাদের।' ধীরে ধীরে বলল আরিফ, 'একান্তই যদি দরকার হয়, এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন।'

বিনয়ে বিগলিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, 'সত্যি বলছেন?

খুবই উপকার হয় তাহলে।'

'কিন্তু এক শর্তে।'

ভদ্রলোকের হাস্যোজ্জ্বল মুখ ম্লান দেখাল। আরিফ বলল, 'কণ্ডাকটরকে জানান চলবে না।'

'এসব কি শুরু করেছ?' আইরিন বলে উঠল। কিন্তু আরিফ তার দিকে ফিরেও চাইল না।

'রাজি আছেন?' সে জানতে চাইল।

ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফিরে আসে। 'বিলক্ষণ রাজি। তাহলে অনুমতি করুন…'

আরিফ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিয়ে আসুন আপনার স্ত্রীকে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

'তুমি…তুমি পাগল হয়ে গেছ নাকি?' আইরিন রাগ সামলাতে পারছে না। 'এ কামরাটা কি দোষ করল? অন্য কামরা যদি না পাওয়া যায়?'

'অন্য কামরার দরকার নেই আমাদের।'

'কিন্তু কেন?' অসহিষ্ণু শোনাল আইরিনের কণ্ঠ। 'তুমি কি সারারাত বসে বসে জানি করার কথা ভাবছ নাকি?'

আরিফ আইরিনের কাঁধে হাত রাখল। 'আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমার মনে হচ্ছে, এখানে থাকা চলবে না আমাদের। প্রমাণ করতে পারছি না, কিন্তু কাজটা ঠিক করছি আমি, কোন সন্দেহ নেই।'

আইরিন কিছু বলার আগেই আগন্তুক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর

হাত ধরে কামরায় ঢুকলেন। পুতুলের মত মেয়েটি। অভিযোগ ভুলে তার দিকে তাকিয়ে রইল আইরিন। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে সে জানালার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝাঁকুনি সামলাচ্ছে। গালে সমরখন্দ-বোখারার চেয়ে দামী একটা তিল। মেহেদী রঞ্জিত হাতে একটা নতুন ব্যাগ, তার ময়ূরকণ্ঠী শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলান। তার শরীর থেকে বিয়ের সুবাস আসছে, আইরিন অনুভব করল। সম্ভবত তারা হানিমুনে এসেছিল।

আরিফ আইরিনের হাত ধরল তার বাম হাতে। ডান হাত বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। বলল, 'আশা করি, রাতটা চমৎকার কাটবে আপনাদের। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, অ্যাটেণ্ডেণ্ট বা কণ্ডাকটরকে কিছু বলবেন না। ওরা ঝামেলা করবে।'

'একটুও ভাববেন না,' আশ্বাস দিলেন ভদ্রলোক, কালো ব্রিফকেস টি-টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি। ওদের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না আমাদের।'

লজ্জায় আরক্ত হল যেন নববধূটি। তার হাসি ভারি ভাল লাগল আইরিনের। হাসলে বউটিকে 'ফাইভ ডলস্ ফর অ্যান অগাস্ট মুন' ছবির নায়িকার মত লাগে। তার দিকে চেয়ে বড়বোন মার্কা হাসি হাসল আইরিন, যার অর্থ, এত লজ্জা পাবার কি আছে?

'চলি তাহলে?' আরিফ বলল।

'আচ্ছা,' উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। খুব উপকার হল।'

রুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল ওরা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আইরিন, 'একটু আস্তে চল, আরিফ, এসবের কোন দরকার ছিল না আসলে।'

আরিফকে নির্বিকার দেখাল। মনে হল না, সে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ভেবে পেল না আইরিন, তারা যাচ্ছে কোথায়!

একটার পর একটা কামরা পার হয়ে আরিফ 'ট' কামরায় পৌঁছুল। এটাই শেষ কামরা। তৃতীয় শ্রেণীর। কাঠের সীট। বত্রিশ জনের জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসেছে অন্তত পঞ্চাশ জন যাত্রী। টিমটিমে আলো জ্বলছে। সবগুলো ফ্যান ঘুরছে না। সিগারেটের ধোঁয়া, মাস্তান ছোকরাদের বিচিত্র সব কথা আর সুরের কোরাস গান, বাদবাকি যাত্রীদের অবিশ্রান্ত বাক্যালাপ, জোরাল রাজনৈতিক বিতর্ক, সব মিলিয়ে নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে এই কামরাটি।

দরজার কাছে সামান্য ফাঁকা জায়গা ছিল। আইরিনকে সেখানে দাঁড়াতে বলে যাত্রীদের দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে আরিফ এগিয়ে গেল। এককোণে বসা দু'জন শান্তশিষ্ট কলেজ-ছাত্র গোছের যাত্রীর সঙ্গে ফিসফাস করে কথা বলতে শুরু করল। পুরো ব্যাপারটা অসহ্য লাগছে আইরিনের। তার কাছ থেকে মাত্র আড়াই ফুট দূরে, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে বসে আছে এক যাত্রী। সামনে একজন ভদ্রমহিলাকে দাঁড়াতে দেখেও শালীনতা রক্ষার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে আইরিনের দিকে। এরকম

অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল আরিফ। তার হাতে থার্ড ক্লাসের দু'টো টিকেট।

ছেলে দু'টো সিট ছেড়ে বাঙ্কের ওপর থেকে তাদের ব্যাগ নামাল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল করিডর ধরে। আরিফ পরিত্যক্ত আসনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল আইরিনের দিকে ফিরে। লম্বা সিটগুলোতে চারজনের জায়গায় ছ'জন যাত্রী বসেছে। কারও হাঁটুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে, কারও পা মাড়িয়ে দিয়ে বহু কষ্টে ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে আইরিন জানালার পাশের সিটে গিয়ে বসল। তার পাশের একজন ঘুমন্ত যাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আরিফ নিজের জায়গা করে নিল এবং বসে পড়ল আইরিনের গায়ে গা ঘেঁষে।

'কি বললে তুমি ওদের ?' জিজ্ঞেস করল আইরিন ফিসফিস করে, 'ওরা আমাদেরকে সিট ছেড়ে দিল কেন ?'

আরিফ বলল, 'আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট দু'টো ওদের দিয়ে দিয়েছি যে !'

'কেন, জানতে চাইল না ?'

'বুঝিয়ে বললাম, জার্নিতে বেশি খরচ পত্তর করে ফেলেছি বলে আমার স্ত্রী খুব রেগে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট তাকে দেখাতে পারছি না। ছেলেগুলো সহজ-সরল ধরনের। সমস্যাটা বুঝল।'

'কিন্তু এই কামরায় এভাবে বসে সারারাত জার্নি করা সম্ভব, বল ?'

'আমি এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত ঘুরেছি। জানালার বাইরে তাকাও। তাহলে আর অতটা খারাপ লাগবে না। তাছাড়া আমাদের জন্যে অনেকখানি নিরাপদ এ কামরা। কেউ ভাবতে পারবে না, কক্সবাজারে যারা হাওয়াই হোটেলে থাকে, তারা এই কামরায় জানি করতে পারে!'

আইরিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কামরাটা ভাল করে দেখল। হাত-ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নাকমুখ ঢাকল। তাদের সারির একজন সহযাত্রী সস্তা সিগারেট ধরিয়েছে। দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আইরিনের মুখে। অসহ্য!

'আই'ম সরি, তামান্না, আমাকে দু'দিনের জন্যে সঙ্গ দিয়ে কি বিপদেই না পড়েছ তুমি! সবকিছু বাদ দিয়ে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন আমার একমাত্র চেষ্টা।'

'কিন্তু তোমার চেষ্টাটা খুব হাস্যকর।'

আরিফের মুখখানা কঠোর দেখাল। 'যখন ব্যাখ্যা করতে পারব, তখন বুঝবে এটা হাস্যকর প্রচেষ্টা ছিল কি না।'

আইরিন বলল, 'এখন থেকেই তোমার ব্যাখ্যা অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি। আমার বিশ্বাস, পুরো ব্যাপারটা আসলে মস্ত এক পাগলামি।'

'আহা! তাই যদি সত্যি হত!'

আরিফের কণ্ঠের বিষণ্ণতা আইরিনকে স্পর্শ করল। আইরিন বুঝতে পারছে, আসলেই বিপদের মধ্যে রয়েছে তারা। এর মধ্যে ভণিতা নেই কিছু। কিন্তু কথোপকথনও ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠল। সামনের সিটের যাত্রী দু'জন খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

আরিফের ইঙ্গিত পেয়ে সে কথা বন্ধ করে চোখ বুজল।

ঘুমোনোর চেষ্টা করাও বৃথা। এভাবে ঘুমোনোর কথা আইরিন কখনো কল্পনাও করেনি। শক্ত কাঠের সিটে মাথা রেখে জানালার বাইরে তাকাল সে। দূরের গ্রামে হঠাৎ চোখে পড়ছে চকিত আলোর আভাস।

ঘটনাবহুল গত দু'টো দিন তার চোখের পাতায় ভাসছে। কেউ বিশ্বাস করবে না, এমনটি হতে পারে। আইরিন চৌধুরী অজানা অচেনা একজন লোকের হাত ধরে সহসা নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেবে, এটা কখনও সম্ভব?

হোটেলের বিল পরিশোধ না করেই পালিয়েছে, ভেবে লজ্জায় নুয়ে পড়ল সে। তামান্নার নামে অফিসের ঠিকানায় বিল পৌঁছে যাবে। উকিলের চিঠি পেলেও অবাক হবার কিছু নেই। ব্যাপারটা যদি প্রথমেই তিথির হাতে পড়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেবে। কিন্তু তা না হলে এ নিয়ে কি ধরনের হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হতে পারে ভাবতেই পারছে না আইরিন।

আর বুঝতে পারছে না আরিফের সেই 'ওরা' কারা? অনেকগুলো সম্ভাবনার কথা মনে এসেছিল, কিন্তু যুক্তির বিচারে একটাও ধোঁপে টেকে না। বারবার জিজ্ঞেস করতে ভাল লাগে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, আরিফ ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছে। আপাতত উত্তর দেবার কোন ইচ্ছা নেই। তবে কথা দিয়েছে, সব খুলে বলবে। কিন্তু কখন?

ট্রেনের গতি দ্রুততর হল। বেশ কিছুক্ষণ হল গায়কের দল তাদের উদ্ভট কথা আর সুরের কোরাস থামিয়েছে। রাজনীতি-

প্রিয় যাত্রীদের রাজা-উজির মারার উচ্ছ্বাসও স্তিমিত। ঘুমে ঢুলছে অধিকাংশ যাত্রী। পরিবেশটা আইরিনের সহ্য হয়ে আসছে। সে পা-দু'টো টানটান করে সামনে এগিয়ে দিল। হোটেল থেকে বেরোনোর সময় সে জুতো না নিয়ে শুধু ঘাসের চপ্পল পায়ে গলিয়ে নিয়েছে, ভাবতেই নিজের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার ওপর শ্রদ্ধা বোধ করে সে। এই আরামদায়ক চপ্পল পায়ে না থাকলে এতক্ষণে ব্যথায় টনটন করে উঠত তার পা।

আরিফ তার আরও কাছ ঘেঁষে বসে বলল, 'কেমন লাগছে?'

'বলব না।' উত্তর দিল সে।

'আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা কর। জানই তো, "যস্মিন দেশ, যদাচার" বলে একটা কথা আছে…'

'নেকস্ট্ ইমপিসবল্!' মৃদু ঝামটা দিল আইরিন। ব্যাগের ভেতর থেকে টেনে বের করল তার কমপ্যাক্ট-কেস। কামরার ম্লান আলোতেও ঝকমক করে উঠল সেটা। কভারটা সোনার। ইনসেটে রুবি আর ডায়মণ্ডে আইরিনের টানা হাতের স্বাক্ষর। অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা দামের কমপ্যাক্ট-কেস এই সামান্য চাকরিজীবী মেয়েটির হাতে! বিস্মিত আরিফ তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠল আইরিন, 'অমন করে দেখছ কেন? সোনার তো নয়, 'গিল্টি করা।' বলেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। ওই ক্ষুরধার চোখ সোনা আর গিল্টির পার্থক্য বুঝবে না, তা-ও হয় কখনো?

যা ভেবেছিল! অস্বাভাবিক শান্ত চোখ পাঁচসেকেণ্ড আইরিনের দিকে মেলে রেখে আরিফ বলল, 'কচি খোকা ঠাওরাচ্ছ

কেন আমাকে ? বরং ঝটপট বলে ফেল, কে ওটা দিয়েছে তোমাকে ?'

আইরিন আরিফের দিকে তাকাল। আরিফের চোখ ছোট হয়ে এসেছে। জেলাসি ! আইরিনের হৃদয়ে তুফান বইল হঠাৎ। প্রিয় পুরুষের জেলাসি আবিষ্কার করাটা প্রত্যেক নারীর কাছে এক সাংঘাতিক উত্তেজনাকর ব্যাপার। আইরিনের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি খেলে গেল।

'তোমার মত আমারও কিছু গোপন ব্যাপার থাকতে পারে।'

আরিফ বলল, 'চারদিকে এত লোকজন না থাকলে মজা টের পেতে ! জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতাম তোমার কমপ্যাক্ট !'

আইরিন আলতো করে মুখে পাউডারের তুলি বোলাল। ঠোঁটে ছোঁয়াল লিপস্টিক। তারপর নির্বিকারভাবে কমপ্যাক্ট-কেস ব্যাগের ভেতর রেখে আরিফের দিকে তাকাল।

'অ্যাই, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে ?'

আরিফের হাত সজোরে চেপে ধরল তার কাঁধ আর বাহু, যেন তার বুকের মধ্যে পিষে ফেলবে আইরিনকে।

'অমন বিলোল কটাক্ষে যদি তাকাও, মেয়ে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল আরিফ, 'প্রকাশ্যে চুমু খাব তোমায়।'

চোখ নামিয়ে নিল আইরিন। সহ্য করতে পারছিল না পুরুষমানুষটির কামনাতপ্ত চোখ, চুম্বনের বাসনায় কম্পমান অধরোষ্ঠ। তার কাঁধে মাথা রাখল সে।

ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমোব।'

আইরিনের কপালে নিজের চিবুক ছুঁয়ে আরিফ বলল, 'সিলেট পৌঁছে ওই রকম নতুন একটা উপহার দেব তোমায়। আমি চাই না, কোন এক আই. সি'র স্মিতিচিহ্ন বয়ে বেড়াও তুমি। সেটা আমার সহ্য হবে না।'

আবার ভাবনায় পেয়ে বসে আইরিনকে সে জানে, কমপ্যাক্ট-টার দাম ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়। প্রেমিকাকে এত দামী উপহার দেবার সামর্থ্য আছে তার! করে কি সে? কুখ্যাত কোন স্মাগলার নয় তো? কিংবা বিদেশী চর? এত বেহিসেবী খরচ সে করছে কী করে?

কিন্তু কিছুতেই মেলান যায় না। নাহ্, যাই হোক সে, পরে জানা যাবে। কিন্তু খারাপ লোক নয় সে। তাকে বিশ্বাস করা যায়। আর···আর···ভালবাসা যায় তাকে। 'তাকে ভালবেসে ভুল করনি তুমি।' অসংখ্যবার নিজেকে বলল সে।

চোখে সূর্যের আলো এসে ঘুম ভাঙাল তার। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। চমৎকার ঘুমিয়েছে সে। আরিফ তার অবশ হয়ে যাওয়া হাত অন্য হাতে মালিশ করছে। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আইরিনের। পুরো ঘুমের সময়টা সে ওই হাত বালিশ হিসেবে ব্যবহার করেছে! খুবই কষ্ট দিয়েছে আরিফকে।

'ক'টা বাজে?' আইরিন জানতে চাইল।

'পৌণে সাত।'

'মাগো, মা! চার ঘণ্টা এইভাবে ঘুমিয়েছি আমি? তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না? একটুও ঘুমোতে পারনি তুমি। ভেরি সরি, আরিফ, রাগ কর না।'

'আমার হাতটা ঘুমিয়েছে।'

আরিফের অবশ হাতটা ম্যাসেজ করতে সাহায্য করল আইরিন। 'আর তুমি?'

'আমি জেগে জেগে শুধু তোমাকে দেখলাম আর ভাবলাম।'

'ভেবে ভেবে কি বের করলে?'

'মনে করিয়ে দিও, পুরোটা একসময় তোমাকে বলব। এখন নয়।'

ট্রেন শ্রীমঙ্গল স্টেশনে থামল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে রুটি আর ফলের হকারদের খুঁজতে খুঁজতে আরিফ বলল, 'তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি নাশতার খোঁজ করছি।'

আইরিন হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখল, আরিফ প্রচুর কলা, আপেল, নাশপাতি আর পাউরুটি জোগাড় করেছে। তাকে বসিয়ে আরিফ বাথরুমের দিকে গেল। 'খেতে শুরু কর। দু'-মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। প্ল্যাটফরমের শেষ অংশে দাঁড়ান এক প্রৌঢ় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। না, সে তামান্নাকেই দেখছে। আইরিন চৌধুরীকে নয়। আইরিন চৌধুরীর পরিচিত কেউ তাকে এই থার্ড ক্লাসের কামরায়, এই অবস্থায় চোখে দেখলেও, বিশ্বাস করবে না।

আইরিন আপেলে একটা কামড় দিয়েছে, এমন সময় সামনের সিটের ভদ্রলোক ফিরে এলেন। তিনি হাতমুখ ধোবার জন্যে কাছাকাছি কোন টয়লেট খালি না পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তার সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?

আধঘণ্টা লাগল তোমার মুখ ধুতে?'

'আর বলনা,' চোখ দু'টো মটরদানার মত হয়েছে ভদ্রলোকের। 'ফার্স্ট ক্লাসে একটা খুন হয়ে গেছে ভোর রাত্রে।'

'খুন!'

'তবে আর বলছি কি? একটা কামরার ভেতর থেকে লক্ করা ছিল। অ্যাটেনডেন্ট গার্ডের সন্দেহ হয়েছিল, দরজা ভেঙে ঢুকে দেখেন, দুটো ডেডবডি। অ্যাশকালার স্যুট পরা ভদ্রলোক আর নীল রঙের শাড়ি পরা মহিলা। গালে তিল। কি যে সুন্দর দেখতে!'

আইরিনের মুখ থেকে আপেলের টুকরো পড়ে গেল। অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখল, আরিফ ফিরে আসবার সময় কথাগুলো শুনে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেন ফ্রিজ হয়ে গেছে।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজের জায়গায় বসে সামনে ঝুঁকে পড়ল আরিফ। আইরিন তার পিঠে হাত রাখল।

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলল, 'ভাই, ডেডবডি দেখেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ,' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'তাদের দিকে তাকান যায় না। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে পেট আর বুক। মাথায়ও দু'একটা ছিদ্র দেখলাম।'

'দরজা তো লক করা ছিল।' অন্য এক যাত্রী জিজ্ঞেস করলেন। 'তাহলে খুনী ঢুকল কোন্ পথে?'

'জানালা দিয়ে। আলামত পাওয়া গেছে। পুলিশ অফিসাররা

আশেপাশের যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তাঁদের ধারণা, ট্রেন আখাউড়া ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে জানালা দিয়ে খুনী ঢুকে পড়ে কামরায়। বেচারা দু'জন কম্বল মুড়ি দিয়ে পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। আহা, চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু বোধহয় জানতেও পারেনি।'

'মালপত্র খোয়া গেছে?' আরিফ জানতে চাইল।

'না। সব ঠিক আছে। খুনের কারণটা খুব জটিল। পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে। ঠিকই বের করে ফেলবে। আজকাল বছর বছর পুলিশ অফিসারদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠান হচ্ছে ট্রেনিংয়ের জন্যে।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা শুনতে পেল আইরিন। বুঝতে পারল, ওর মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। আরিফ শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল।

তাহলে সব সত্যি! আরিফের বাড়াবাড়ি ছিল না কোনটাই। এটুকু না করলে তারা প্রাণে মারা পড়ত। 'ওরা' তাহলে ট্রেন পর্যন্ত ফলো করে এসেছে। অথবা হয়ত আগে থেকেই ছিল। শেষ মুহূর্তে ইঙ্গিত পেয়েছে। যেভাবেই হোক, পাকা খবর ছিল তাদের কাছে, কোন সন্দেহ নেই।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তাদের কামরা আবার সরগরম হয়ে উঠল আলোচনায়। নতুন প্রসঙ্গ সত্যিই খুব উত্তেজনাকর। বিশেষত, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, নিহত দম্পতি ঐ কামরায় ঢুকল কিভাবে, সেটাই এক দুর্ভেদ্য রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাটেনডেন্ট নাকি কিছু জানে না।

'এরকম রহস্য আমরা অনেক দেখেছি,' একজন মন্তব্য করলেন, 'তদন্ত করে দেখুন গিয়ে, ওরা নিজেরাই নিজেদের মেরেছে।'

অন্যজন বললেন, 'বলা যায় না, হতেও পারে। আজকাল কতরকমের ক্রাইম হচ্ছে! মানুষ বড় জটিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!'

সদ্যবিবাহিত দম্পতির কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে পড়ল আইরিনের। জীবনটা খুব আশ্চর্যের। এই মুহূর্তে কার মৃত্যুর ভার কে, কিভাবে, কেন কাঁধে নিচ্ছে, কিছুই বলা যায় না। মিষ্টি ওই দম্পতি পরস্পরের উষ্ণ সোহাগ শরীরে মেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা আর বেঁচে নেই। বিনা অপরাধে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তাদের দেখতে যাবারও উপায় নেই। এতবড় ঝুঁকি নিতে কোনক্রমেই রাজি হবে না আরিফ। নইলে লাশদু'টো দেখতে যেত আইরিন। যে মৃত্যুর বিনিময়ে নিশ্চিত মৃত্যু এড়াতে পেরেছে সে, এই পৃথিবীর আলোহাওয়া দেখছে, মানুষের শব্দমুখর জীবনযাত্রা অবলোকন করছে, সে মৃত্যুর চেহারা দেখে আসতে মন চাইল তার। কিন্তু কোন উপায় নেই। ফার্স্ট ক্লাস তাদের জন্যে খুব খারাপ জায়গা এখন।

এই প্রথম সত্যিকারের ভয় সংক্রমিত হল আইরিনের মধ্যে।

ট্রেন সিলেট পৌঁছোল। পুলিশে ছেয়ে গেছে স্টেশনের প্ল্যাটফরম। ফার্স্ট ক্লাসের দিকেই তাদের নজর। প্রত্যেক যাত্রীকে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। শুধু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকুল তাদের সন্দেহের ঊর্ধ্বে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা।

'সাবধান, তামান্না,' পেছন থেকে ফিসফিস করে হুঁশিয়ার করল আরিফ, 'একদম কাছছাড়া হবে না। লেপ্টে থাকবে আমার সঙ্গে। গাড়ি নিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যাব আমরা। আগে কিছু খাওয়া দরকার।'

'একটুও খিদে নেই আমার।' আইরিন বলল।

ট্যাকসিতে বসে শরীরের ভার ছেড়ে দিল ওরা। ট্যাকসি চলতে শুরু করল।

মিষ্টি রোদ উঠেছে। সিলেটের পাহাড়ী রাস্তা আর উঁচু অট্টালিকাগুলোর ছাদে যেন চড়ুই পাখির মত লাফিয়ে পড়েছে সেই রোদ। মুহূর্তের মধ্যে আইরিনের মনটা ভাল হয়ে গেল। আরিফের কাছ ঘেঁষে বসল সে।

পাঁচ

বোগেনভিলিয়া আর মাধবীলতার ঝাড় ঢেকে রেখেছে জীর্ণ, পুরাতন দোতলা বাড়িটাকে। প্রশস্ত ড্রাইভওয়ে পর্চ, গ্যারেজ ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর চলে গেছে। সেখানে ঘন সুপারিবাগান, উঁচু দেয়ালে ঘেরা। তার পেছনে দু'টো পাহাড়কে যুক্ত করেছে একটা টিলা। টিলার গা বেয়ে উঠে গেছে হাঁটাপথ।

ট্যাকসি পর্চে থামল। আইরিন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে দেখতে থাকে বাড়িটা। চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আরিফ নিজে থেকেই উত্তর দিল, 'এটা আমার পরিচিত জায়গা। যুদ্ধের সময় অনেকদিন পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিলাম এখানে। বাড়িওয়ালীকে আমি খালা বলে……'

কথা শেষ হল না। মাধবীলতার আড়াল ভেদ করে বাঁশের দরজা খুলে গেল। ট্যাকসি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল আরিফ। আইরিন নামল। ব্যাগটা তুলে দিল আরিফের হাতে।

এক স্থূলকায়া বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন। মহা শোরগোল তুললেন তিনি আরিফকে দেখে।

'আরে, এ যে আমাদের ইফিক্কার! ভাল আছ, বাবা? জানতাম, তুমি আসবেই একবার। ছেলে কোনদিন মা-কে দেখতে না এসে পারে? সেই যে তুমি গেলে, আর খবর দিলে না। কি ছেলে গো, বাবা, তুমি? এস, এস।'

'তোমরা ভাল আছ, খালা?' বৃদ্ধার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল আরিফ। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটা দেখছে আইরিন।

'আমার আর ভাল থাকা! একটার পর একটা ঝুটঝামেলা লেগেই আছে। বড় মেয়ের মেজ ছেলেটা ডায়রিয়ায় মারা গেল। কার্তিক মাসে আমি ভুগলাম বাতজ্বরে। ছোট মেয়ে বানু'র কথা মনে আছে? বিয়ে দিয়েছি। গত মাসের সতের তারিখে বাচ্চা হয়েছে। ছেলে।'

দোতলায় বেতের চেয়ার পেতে তাদের বসতে দিলেন বৃদ্ধা। আইরিনের কথা এতক্ষণে মনে হল তার।

'এটি কে গো? তোমার বউ? কবে বিয়ে করলে? আমাদের জানালেও না, বাবা?'

'না, না,' ব্যস্ত হয়ে বলল আরিফ, 'ওর নাম তামান্না। আমার বন্ধু। খুব উপকার করেছে আমার। আমার সঙ্গে সিলেটে বেড়াতে এসেছে।'

চোখ বড় বড় করে বৃদ্ধা বললেন, 'ও, আচ্ছা।' শব্দ দু'টো সংক্ষিপ্ত হলেও এর অর্থ অনেক বড়। আইরিন হাত তুলে সালাম দিল। জবাবে বৃদ্ধা কাছে টেনে নিলেন তাকে। গালে গাল ঠেকিয়ে বললেন, 'ইফিক্কারের বন্ধু মানেই আমার মেয়ে।

মিষ্টি চেহারা তোমার। নামটিও খাসা। তামান্না। চোখের নিচে কালি কেন, মা? পথে বেশ কষ্ট হয়েছে তো? ঠিক ধরেছি। আজকাল পথে বের হওয়াই দায়। খিদে লেগেছে তোমাদের? পাঁচ মিনিট বস। খেতে দিচ্ছি। পরোটা ডিমভাজা আর সুজির হালুয়া। চলবে? হাবিব বজ্জাতটা কাল দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে তাজা হয়ে সেই যে বের হল, এখন পর্যন্ত আর ফেরবার নাম নেই। সে থাকলে মিষ্টি, কলা এসব আনাতে পারতাম। কি আর করব? আমার কপাল! নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া ছেলে কেউ পেটে ধরে?'

সুযোগ পাওয়ামাত্র বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল আরিফ। 'হাবিবুর রহমান কি করে আজকাল?'

'কিছুই করে না, বাবা। আগের মতোই টো টো কোম্পানির ম্যানেজার।' রান্নাঘরের সামনে ডাইনিং স্পেসে চেয়ার টেনে ওদের বসতে দিয়ে চুলোর দিকে গেলেন বৃদ্ধা।

আইরিন ইতস্তত করে বলল, 'যদি কোন অসুবিধে না হয় আপনাদের, আমি একটু গোসল করতে পারি?'

'একশোবার মা, একশোবার। ইফিক্কার, তোমার বন্ধুকে বাথরুম দেখিয়ে দাও। বেসিনের পাশে ভাল সাবান আছে। তোয়ালে টাঙান আছে পেছন দিকের ব্যালকনিতে।'

সরু প্যাসেজ পার হয়ে বাথরুমে যাবার পথে বাড়ির পেছনটা ভালভাবে দেখা যায়। ঘন জঙ্গলের মত জায়গাটা। এত গাছ-গাছালি যে, পেছনের দেয়ালটা পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। জায়গাটার এক ধরনের সম্মোহনী ক্ষমতা আছে বলে মনে হল আইরিনের।

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার ঠিক আগে তোয়ালের কথা মনে পড়ল। আরিফ ততক্ষণে ফিরে গেছে ডাইনিং রুমে। বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে হৈ হৈ করে গল্প জুড়েছে। ভারি আমুদে লোক। এত কষ্টের পরও ওর চোখেমুখে প্রাণ প্রাচুর্যের ছোঁয়া। এই হাসিখুশি মানুষটার জীবনে কোন্ বিপদের কালো মেঘ নেমে এসেছে? তাকে কোনভাবে সাহায্য করা যায় না? কিন্তু নিজের পরিচয়, বিপদ, সবকিছু সম্পর্কে যে এত রহস্যজনকভাবে নীরব, তাকে সাহায্য করার পথ কই?

তোয়ালে খুঁজে নিয়ে বাথরুমে ঢুকল আইরিন। ট্রেনের বাথরুমের চেয়ে বিশেষ সুবিধের না। কিন্তু নিজের বাথরুমের জন্যে নস্টালজিয়ায় ভুগে এখনকার অত্যাবশ্যকীয় স্নানপর্বটাকে অসম্পূর্ণ করার কোন মানে হয় না। তার বাথরুম ঢাকা শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাথরুম। পুরোটা মার্বেল স্ল্যাবে তৈরি। অত্যাধুনিক টাবটি পাথরের। মাথার ওপর বিদ্যুৎচালিত ঘূর্ণায়মান শাওয়ার। অটোম্যাটিক হিটিং অ্যাণ্ড কুলিং সিসটেম। চারদিকের দেয়াল জুড়ে আয়না।

গোসল সেরে বেরিয়ে দেখল, ডাইনিং টেবিলে দু'টো প্লেটে ওমলেট সাজাচ্ছেন বৃদ্ধা। পরোটা আর ওমলেটের গন্ধে জিভে পানি এসে গেল আইরিনের। এতক্ষণ যে সন্ত্রস্ত ভাবটা তার পাকস্থলী আর গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে খিদে আটকে রেখেছিল সেটা উড়ে গেল। 'সুখাদ্যের কত গুণ, ভয় পর্যন্ত ভেঙে দেয়!' ভাবল আইরিন।

ওদের খাওয়া শেষ হতেই দরজার বেল বাজল। বিরক্তিকর-

ভাবে বাজিয়েই চলেছে। কে এই অসভ্য ? বৃদ্ধা দরজা খুললেন। তিনি এই ধরনের আচরণের সঙ্গে পরিচিত। দরজায় উঁকি দিল হাবিবুর রহমানের মাথা। তারপর সশরীরে অগ্রসর হল সে আরিফের দিকে।

'আরে, ইফতেখার ভাই যে! কি সর্বনাশ! আপনি এতদিন পর এলেন ? কেমন আছেন ?'

'ভাল। তোমার কি খবর ?'

'এই তো, চলে যাচ্ছে এক রকম। আমাদের কথা আলাদা। আপনাদের মত মুখে সোনার চামচ নিয়ে তো জন্মাইনি!'

'অ্যাই, হতচ্ছাড়া, খেয়েছিস কিছু ?' বৃদ্ধা মৃদু ধমক দিলেন উনিশ বছরের অপরিণত বুদ্ধির তরুণটিকে। 'পরোটা আছে। দেব ?'

'পরোটা খাওয়ার লোকের অভাব নেই তোমার, মা।'

হাবিবুর রহমানের কথাই এরকম। তার কথার তিনটি বৈশিষ্ট্য আরিফের কাছে ধরা পড়েছে। অকারণ জটিল, আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক। কেউ কেউ এভাবে কথা বলতে পছন্দ করে। চোখের ইশারায় বিস্মিত আইরিনকে বোঝাতে চেষ্টা করল আরিফ। কিন্তু হাবিবুর রহমান অন্য একটা বিষয়ে মগ্ন, বোঝা গেল। সে তার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'দু'টো সন্দেহজনক লোক আমাদের এলাকায় ঘুরছে, জান ?'

আরিফের চোখদু'টো জ্বলে উঠতে দেখল আইরিন। 'দু'টো লোক ?'

'হুঁ।'

'কেমন দেখতে?' জিজ্ঞেস করল আরিফ।

দেখতে দেশী। কিন্তু ভাঙা ভাঙা, অশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। চকরা বকরা কাপড়। চোখে গগলস্।'

মাথার চুল খামচে ধরে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল আরিফ। 'আমি একটা ডাহা বেকুব। ওরা ভালভাবেই জানে, সিলেটে এলে আমি কোন এলাকায় থাকব। এখানে আসার আগে কথাটা স্মরণ হওয়া উচিত ছিলো আমার।'

আইরিনের বুকের মধ্যে আবার ভয়ের ডমরু বাজল। 'এখন কি করব আমরা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

'খালা, বাথরুমের পেছনে একটা দরজা ছিল। ওটা এখনও আছে?' রুদ্ধশ্বাসে বললো আরিফ।

'আছে।' বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে বললেন। 'কেন, বাবা? কারা খুঁজছে তোমাকে?'

'সব পরে জানাব। এখন আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিন, খালা। ওরা যে কোন সময় এসে পড়বে।'

'হাবিব, শিগগির যা। ওদের টিলার রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।'

হাবিবুর রহমান আয়েশ করে জাঁকিয়ে বসল চেয়ারে। 'ধুত্তোর, মা, জ্বালাতন কর না। নিজের ঝামেলাতেই বাঁচি না। লাভ কি বড় লোকদের সেবা করে?'

'নগদ পয়সা লাভ।' পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে বাতাসে দোলাল আরিফ। 'এটা পাবে তুমি। ভেবে দেখ, লাভ না লোকসান।'

'আরও একটা বের করুন, ইফতেখার ভাই। আপনার অনেক টাকা।'

'তিনশো পাবে। চল।'

উঠে দাঁড়িয়ে মধুর হাসি উপহার দিল হাবিবুর রহমান। 'রাগ করলেন না তো, ইফতেখার ভাই? ঠাট্টা করছিলাম।'

আরিফ নিচু হয়ে বৃদ্ধার পায়ে সালাম করল। বৃদ্ধার ছলছল চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে।

'ভাল থেক, বাবা। আল্লা সহি সালামতে রাখুক। যেখানেই থাক, একটা খবর দিও।'

'আচ্ছা, খালা।'

যে বাগানটা আইরিনকে এত টানছিল, যার বৈশিষ্ট্য তার মনে এত দাগ কাটছিল, তা অতিক্রম করার সময় সে শিউরে উঠল। বারবার মুঠি করে ধরল আরিফের জামা।

আরিফ ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেয়ো না। হাবিব যতই খারাপ ব্যবহার করুক, বিপদে ফেলবে না।'

সুপারিবাগানের আড়ালে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আরিফ। ডোরবেল বাজছে। খালার গলা শোনা গেল। অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল অন্য প্রান্ত থেকে। 'দরওয়াজা একটু খুলিবেন?'

আইরিনের হাত চেপে ধরল আরিফ।

'যথাসময়ে বেরিয়ে পড়েছি।' ফিসফিস করে বলল সে।

অর্ধচক্রাকারে টিলা প্রদক্ষিণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে পড়ল ওরা। পথের বাঁ-দিকে একটা স'মিল। স'মিলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেটা।

স'মিলের অফিস রুমের সামনে ম্যানেজারের হাঁক শোনা গেল। 'কি, হাবিবুর রহমান, কাজকর্মের চেষ্টা করছ, নাকি বুড়ো মায়ের অন্ন ধ্বংস করে পরের বেগার দিচ্ছ?'

সেদিকে দৃকপাত না করে এগিয়ে যাচ্ছিল হাবিবুর রহমান। তাকে হঠাৎ থামাল আরিফ।

'দাঁড়াও, হাবিব।'

হাবিব যন্ত্রচালিতের মত পিছিয়ে এল খানিকটা।

'একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারবে?'

মাথা চুলকাল হাবিবুর রহমান।

'আমার এক বন্ধু আছে, কাছেই থাকে, ওর গাড়ি আছে। আপনি যেখানে যেতে আদেশ করবেন, নিয়ে যাবে, কিন্তু···ইয়ে ···একটু বেশি চার্জ করে। অবশ্য টাকা কোনো সমস্যা নয় আপনার কাছে।'

আরিফ হুকুম করল, 'এক্ষুনি গিয়ে তাকে নিয়ে এস। আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

হাবিবুর রহমান তখনও ইতস্তত করছে দেখে ঝট্ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালেট বের করল আরিফ। 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না মনে হচ্ছে! আগে তো এত সন্দেহ-পরায়ণ ছিলে না!'

পাঁচশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরতেই হাবিবুর রহমান প্রায় ছোঁ-মেরে কেড়ে নিল সেটা।

আরিফ বলল, 'পালাতে সাহায্য করার জন্যে তিনশো টাকা। দুশো টাকা গাড়ি যোগাড় করার জন্যে। আর তোমার বন্ধুকে

বলবে, আশাতীত বকশিস দেয়া হবে তাকে। জল্‌দি কর!'

হাবিবুর রহমান বলল, 'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। দেখি, যদি নুরুদ্দিনকে পাই, আমার এফিশিয়েন্সি প্রমাণিত হবে। আর পাওয়া না গেলে আপনাদের ব্যাডলাক।'

'তাকে পাও বা না পাও, ফিরে এসে জানাবে আমাকে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল হাবিবুর রহমান। রাস্তায় মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বাজে ছেলে।' মন্তব্য করল আইরিন।

আরিফ বলল, 'সমাজে কিছু লোক আছে, যারা সবসময় নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত ভাবতে পছন্দ করে। কিন্তু গুরুত্ব বা সম্মান পাবার মত যোগ্যতা তাদের নেই। এই কন্ট্রা-ডিকশন এদের মধ্যে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস্‌-এর জন্ম দেয়। তখন আক্রমণাত্মক কথা বলে, বিদ্রূপাত্মক আচরণ করে এমনকি জোর করে অন্যের কাছে নিজের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করে তারা।'

'কিন্তু এর জন্যে সমাজব্যবস্থাও দায়ী।'

'ওহ্‌, ঐ একটাই বুলি তোমাদের। সোশ্যালিস্টদের মানবিক গুণগুলোকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তোমাদের দেশে দীর্ঘদিন সোশ্যালিজমের চর্চা হয়েছে। কিন্তু এর ভাল দিক-গুলো মানুষ গ্রহণ করেনি। দোষগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে মানুষের মধ্যে। তার মধ্যে একটা হল, কথায় কথায় সমাজব্যব-স্থার দোহাই পাড়া। ছাত্র পড়াশোনা করে না, সমাজব্যবস্থার দোষ। কেরানি ঘুষ খায় এর জন্যেও সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী।

সমাজব্যবস্থার ওপর দোষ চাপানোর সুবিধে অনেক। নিজের দায়দায়িত্ব এড়ান যায়।'

আহত বিস্ময়ে আইরিন আরিফের দিকে তাকাল। 'অ্যাই, তুমি আমাকে গালি দিচ্ছ? বুদ্ধিজীবীরা এই ভাষায় গালি দিয়ে থাকেন।'

আরিফ হাসল। 'আমি বুদ্ধিজীবী নই। আর গালি তোমাকে দিচ্ছি না। গালি দিচ্ছি তোমাদের রাজনীতিবিদ, সমাজপতি-দের। গত আশি বছর ধরে সমাজ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক সংগ্রাম না করে তাঁদের উচিত ছিল ফ্যামিলি প্ল্যানিং, গণশিক্ষা, সমবায়, এইসব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ভিত্তি দাঁড় করান। কাজ হত তাতে।'

আরিফ পলাতক নকশাল নেতা, এমন একটা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিল আইরিন। এখন সেটাও কেটে গেল। তার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল সে, 'আসলে কে তুমি, আরিফ? কি তোমার পরিচয়? কারা তোমাকে খুন করার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটছে?'

'লক্ষ্মী সোনা, অধৈর্য হয়ো না। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জায়গা এটা নয়।'

চারদিক দেখে নিয়ে গলার স্বর আরও নামিয়ে আইরিন বলল, 'এখানে তো কেউ নেই।'

'ছেলেমানুষি কর না। পাশেই দেয়াল আছে, দেখেছ? আমি দেয়ালকে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমার···আমাকে তো·····

আইরিনের বিপর্যস্ত, ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বিপন্ন বোধ করল আরিফ।

ধীরে ধীরে বলল, 'কাছে এসে, ভালবেসে তোমার বড় ধরনের ক্ষতি করে ফেললাম আমি। এত দুর্ভোগ, এত কষ্ট তোমার মত ফুলের পাওনা নয়। মনে হচ্ছে, আমি যদি দৈত্য হতাম, তোমার সুন্দর, হালকা শরীরটা দু'হাতে তুলে বুকের ভেতর আড়াল করে উড়ে যেতাম দূরে কোথাও—নিরাপদ, নিরুপদ্রব কোন জায়গায়!'

রক্তের ঢেউ ছুটে এসে আছড়ে পড়ল আইরিনের মুখে। টকটকে লাল হয়ে গেছে গাল। যেন সত্যিই পুরুষমানুষটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল তাকে—ভালবাসায়, স্নেহে, ঔদার্যে।

অনেক কষ্টে মনকে শান্ত করল আইরিন। এখন আবেগের সময় নয়।

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল আইরিন। 'আমরা কোন বিশেষ সরকারী অফিসে বা বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না? ধর, তাদেরকে যদি সমস্যাটা খুলে বলা হয়……'

'কোন লাভ নেই। তাতে বরং লোক জানাজানি বেশি হবে। নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের পায়েই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্তত আরও দু-তিনটে দিন। হয়ত তারপর ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু।'

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে আইরিন দেখল, একটা গাড়ি এসে থেমেছে সামনের রাস্তায়। লাফ দিয়ে নামল হাবিবুর

রহমান।

'যান, ইফতিখার ভাই। নুরুদ্দিন বলছে, ও দু-ঘণ্টার জন্যে আপনাদের ড্রাইভ দিতে পারবে। বিকেলে একটা এনগেজমেণ্ট আছে ওর।'

'থ্যাংক ইউ, হাবিব, মায়ের দিকে লক্ষ্য রেখ। অকারণে হম্বিতম্বি কর না। আবার দেখা হবে।'

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনদিকের দরজা খুলল আরিফ। আইরিনকে ইঙ্গিত করল ঢুকে পড়তে।

মৃদু গর্জন তুলে পনের বছরের পুরোনো মডেলের ডাটসান গাড়ি চলতে শুরু করল। হাবিবুর রহমানের বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে যাব?'

'তামাবিল রোড,' আরিফ উত্তর দিল।

আইরিন ভেবে পেল না, এভাবে ভবিতব্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে কোথায়, কোন অজানার টানে ছুটে চলেছে সে? যদি একটু সময় পাওয়া যেত, আরিফকে বোঝাত সে, ঢাকা এখন সবচেয়ে নিরাপদ তাদের জন্যে। কোনরকমে ঢাকা পৌঁছোন দরকার।

বোঝাতে হল না, প্রশ্নও করতে হল না। আরিফ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ঢাকার দিকে না গিয়ে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছি কেন? আমাদের প্রতিপক্ষ এতক্ষণে ভালভাবেই জেনে গেছে, তুমি ঢাকার মেয়ে। এবার ঢাকার দিকেই ফেরার কথা আমাদের। সুতরাং ঢাকার পথে কত জায়গায় কতরকম নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে ওরা,

বুঝতে পারছি না। তবে ঢাকা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'ওরা তো মাত্র দু-জন, আসামী ধরার এত রাজকীয় আয়োজন কিভাবে করবে ওরা? তা ছাড়া আমার পরিচয়ই বা কোথেকে জানবে?'

'ওরা দু-জন নয়, তামান্না। অসংখ্য।'

আইরিন প্রশ্ন করল না। কিন্তু ওর চোখেমুখে সাইনবোর্ডের মত ঝুলে রইল অসংখ্য প্রশ্ন: ওরা কারা? কেন খুন করতে চায় আরিফকে? কিভাবে দু-তিন দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করে ও? কোথায় পালাতে চায় সে?

চমৎকার ড্রাইভ করে ছেলেটা। কিন্তু খুবই দ্রুত চালায়। ভয়ডর নেই প্রাণে। অনেকটা পথ চলে এসেছে ওরা। ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে আরিফ। না, অনুসরণ করছে না কেউ।

আইরিন ব্যাগ খুলে সোনার কমপ্যাক্ট কেসটা বের করল। আরিফের চোখে ভ্রূকুটি।

'খুবই ভালবাসে লোকটা তোমাকে?'

আইরিন উত্তর দিল, 'না। তোমার ঈর্ষা হবার কোন কারণ নেই, সত্যি বলছি।'

'তখন মিথ্যে বললে কেন, এটা ইমিটেশন?'

'ভয় পেয়েছিলাম, সত্যি কথা বললে তুমি রেগে যাবে, বেশি-রকমের ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়বে।'

'আর তোমার দিক থেকে? তুমি ভালবাস না তাকে? একটুও না?'

'না। বিশ্বাস কর, সোনার হোক আর হীরের হোক, এতে একটুও আগ্রহ নেই আমার। ভুল বললাম, এখনও সামান্য আগ্রহ রয়ে গেছে। কেননা, হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলে এটা বিক্রি করার দরকার হতে পারে।'

মাথা নাড়ল আরিফ। 'সে রকম সম্ভাবনা অবশ্য উড়িয়ে দেয়া যায় না। মাতাল নাবিকদের মত বেপরোয়া টাকা ওড়াচ্ছি আমরা।'

ঘড়ির দিকে তাকাল আরিফ। আর দশ মিনিটের মধ্যে যাত্রা শেষ করতে হবে।

দূরের টিলায় চা-বাগান দেখে খুশি হয়ে উঠল আইরিন।

'অ্যাই, দেখেছ? চা-বাগান। সুন্দর না?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নুরুদ্দিনকে গাড়ি থামাতে বলল আরিফ।

'এখানেই?' নুরুদ্দিন গাড়ির গতি কমিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। এখানেই।'

ওয়ালেট বের করল আরিফ। 'কত আশা কর তুমি?'

নুরুদ্দিন বলল, 'হাবিব বলছিল, আপনি পাঁচশো টাকা দিতে পারেন। তবে আমার ধারণা, ইয়ে, এতটা পথ, শুধুশুধু ফিরতে হবে···আরও দুশো···'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ওয়ালেট থেকে একশো টাকার দশটি নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল আরিফ।

সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল নুরুদ্দিনের।

আরিফ বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমাদের খুব

উপকার হল।'

'ভবিষ্যতে এরকম কোন সমস্যায় পড়লে আমাকে খুঁজবেন। হাবিবের সাহায্য নেবার কোন দরকার নেই। ও খামকা মাঝখান থেকে আমার আয়ে ভাগ বসায়। ঈদগাহ্ রোডে আমার ওয়ার্কশপ আছে। নাম নুরুদ্দিন মোটরস্।'

অদূরে তেমাথায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেল নুরুদ্দিন। আইরিন আরিফের দিকে তাকাল।

'এবার কোথায়?'

'সবচেয়ে আগে তোমাকে পার্ক করতে চাই। একটা নিরাপদ জায়গা দরকার।'

'তার মানে?' চোখ কপালে তুলল আইরিন। 'আমাকে ফেলে কোথাও যাবে নাকি তুমি?'

'হুঁ। কিছুক্ষণের জন্যে তো বটেই। ঐ চা-বাগানটার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব।'

আইরিন কটাক্ষ হেনে বলল, 'মতলব কি তোমার? ওদের কাছে আমাকে বিক্রি করে দেবে নাকি?'

কিন্তু আরিফের ভাবান্তর ঘটতে দেখা গেল না এ কথায়। গম্ভীর মুখে সে বলল, 'এস।'

ছোট একটা টিলা পার হয়ে বাগানের অফিসে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল ওরা।

দারোয়ান বাজখাঁই গলায় সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বলল, 'কি চাই? এদিক দিয়ে সাধারণ লোকের ঢোকা নিষেধ।'

'জানি,' নম্রভাবে বলল আরিফ। 'আমি ম্যানেজার সায়েবের

সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কি দরকার?'

'যদি একটা কাজকর্ম পাওয়া যায়—'

'কি কাজ জানেন আপনি?'

'কুলির সর্দারি থেকে শুরু করে ম্যানেজারি পর্যন্ত সব জানি।' অবলীলাক্রমে উত্তর দিল আরিফ।

দারোয়ান একবার আগন্তুক আর একবার তার সঙ্গিনীকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দার্শনিকের মত চিন্তামগ্ন হল কিছুক্ষণের জন্য।

'লেখাপড়া জানেন? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সুপারভাইজারের একটা পোস্ট খালি আছে। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ঐ গুদামঘরের পাশে ছোট গেট আছে। ওদিক দিয়ে ঢুকে যান।'

আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটল আরিফের মুখে। 'বহুৎ শুকরিয়া, ভাই। অনেক উপকার করলেন। আর একটু উপকার করবেন? আপনার চৌকিতে এঁকে বসতে দেবেন? চাকরিবাকরির ব্যাপারে বড় সায়েবদের কাছে একা যাওয়াই ভাল। ঠিক কিনা?'

'খুব খাঁটি কথা। কোন অসুবিধে নেই। বসেন আপনি এখানে।' বেঞ্চি ছেড়ে সরে দাঁড়াল দারোয়ান।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আইরিন সেখানে বসল। ব্যাগ রাখল পায়ের কাছে। ভ্যানিটি ব্যাগ কোলে রেখে হেলান দিল দেয়ালে।

'তাড়াতাড়ি এস কিন্তু।'

'যাব আর আসব।'

কিন্তু ম্যানেজারের অফিসের বাইরের রুমে ঢুকে আরিফ জানতে পারল, বড় সায়েব তার কোয়ার্টারে গেছেন। কোয়ার্টার ওপর-তলায়। গিন্নি ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে। হাফপ্যাণ্ট পরা উপ-জাতীয় কিশোর পিওনটি অভয় দিয়ে জানাল, তাঁর দেরি হবে না।

পিওনটিকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল আরিফ। কিন্তু সে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল তাকে ঘরের ভেতর বসিয়ে। টেবিলে একদিনের বাসি খবরের কাগজ। তা হোক। গত কয়েক-দিন খবরের কাগজ পড়া হয়ে উঠছে না তার। কাগজটা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল সে। প্রথম পাতায় বিদেশী খবর নেই বললেই চলে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভেতরের পাতা খুলল সে।

হঠাৎ তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত উঠে এল ওপরে। এত কষ্টের পরও শেষরক্ষা হল না? নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে ভীষণ রেগে উঠল সে নিজের ওপর। চা-বাগানে ঢোকার সময় আশেপাশে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। এটা কি করল সে? তার পেছনে তিন-চার জোড়া পায়ের শব্দ। পিঠে ধাতব নল ঠেকিয়েছে একজন।

ছয়

ধীরে ধীরে পিছনে ফিরে তাকাল আরিফ।

'তুমি!' বিস্ময়ের আতিশয্য লুকোতে পারে না সে।

তার পিঠের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগের ইস্পাতনির্মিত প্রান্ত সরিয়ে তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল আইরিন। 'প্লিজ, রাগ কর না। বুঝতে পারিনি, তুমি এমনভাবে চমকে যাবে।'

'কেন এসেছ?'

'উনি দারোয়ানের স্ত্রী। এইমাত্র ম্যানেজারের বাসা থেকে ফিরলেন। বললেন, সায়েবের ফিরতে দেরি হবে। উনি তাঁর নিজের বাসায় গিয়ে বসতে অনুরোধ করছেন আমাকে। আর তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন কোয়ার্টারে গিয়ে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে।'

শ্বাসরুদ্ধকর উদ্বেগ কেটে গিয়ে অকস্মাৎ রাগ তার জায়গা দখল করেছিল। আস্তে আস্তে সেটাও কেটে যাচ্ছে। আরিফ বলল, 'তোমরা নিঃশব্দে ঢুকেছ। হয়ত মজা করতে চেয়েছিলে।'

দারোয়ান বলল, 'মজা না, আমরা ঠিকমতই এসেছি। কিন্তু আপনি এত মন দিয়ে পেপার পড়ছিলেন যে, টের পাননি।'

হতে পারে। আরিফ কথা বাড়াতে চাইল না।

দারোয়ান তার ডিউটিতে ফিরে যেতে উদ্যোগী হল। তার স্ত্রী তাকে অনুসরণ করার আগে আইরিনের দিকে তাকাল। কিন্তু আইরিনের নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

আরিফ বলল, 'আপনারা যান। ও এখানে থাকবে, আমার কাছে।'

'ব্যাপারটা কি?' দারোয়ান ও তার স্ত্রী চলে গেলে ঔৎসুক্য সহকারে জানতে চাইল আরিফ।

'আসল ব্যাপার জানতে চাও তো? একটা অজানা অচেনা মেয়েছেলে তার স্বামীর চৌকিতে বসে গল্প করছে, এ দৃশ্য দারোয়ানের স্ত্রীর পছন্দ হয়নি। নানান প্রশ্নে জর্জরিত করেছে আমাকে। দু'টো সন্দেহ তার। এক, তুমি আমাকে ইলোপ করে পালিয়ে এসেছ, দুই, আমি একটা বাজে মেয়ে এবং তুমি দালাল হিসেবে যার-তার হাতে গছাতে চেষ্টা করছ আমাকে।'

পাঁচ সেকেণ্ড ভাবল আরিফ চোয়াল শক্ত করে। বলল, 'এক কাজ করা যাক, আমরা বরং বিবাহিত বলে পরিচয় দিই ওদের কাছে। নইলে অযথা অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। একসঙ্গে এতগুলো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।'

আইরিনের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'এসব কি বলছ তুমি?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পার,' নির্বিকারভাবে বলল আরিফ, 'বহু লোক আমাকে বিশ্বাস করে। তাদের সঠিক সংখ্যা বললে

তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি স্রেফ পাগলামি নয়?'

'অন্য কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

সত্যিই অন্য কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আইরিন ছটফট করতে করতে ভাবল, দস্তুরমত ফেঁসে গেছে সে। সবটাই পরিস্থিতির কারণে নয়, ভালবাসার দায়েও। লোকটাকে না চিনে না জেনে ভালবেসে ফেলেছে সে। তাকে অস্বীকার করে পালাতেও পারছে না।

বাইরে বিরক্তিকর শব্দ করে একটা জীপ এসে থামল। পিওন জানাল, ম্যানেজার সাহেব এসেছেন।

ম্যানেজারের নাম রাজকুমার সাহা। মাথায় বিস্তৃত সমুদ্রের মত টাক, মাঝখানে সাদা দ্বীপের মত গুটিকতক চুল। অকালে পাক ধরেছে। কিন্তু তার চোখমুখের উজ্জলতা বলে, বয়স পঞ্চাশের সামান্য কিছু বেশি হবে। ঠোঁট ঝুলে আছে কিছুটা, চোখের কোণে মেদ জমেছে। এগুলো অত্যধিক মদ্যপানের ফল, আরিফ ধরেই নিলো। এই বয়সেও তার শরীর যথেষ্ট সুঠাম। পেটের মেদের কথা বাদ দিলে তার শরীর এখনও বয়সকে ত্রিশের কোঠায় ধরে রেখেছে, বলা চলে। তার দৃষ্টি এবং আচরণ সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা সর্বদা হুকুম করতে এবং তা তামিল করানোর ক্ষমতা প্রমাণ করতে পছন্দ করে। নিতান্ত মুরুব্বি না হলে, যার সাথেই সাক্ষাৎ হোক, তাকেই

'তুমি' সম্বোধন করতে অভ্যস্ত এরা।

আরিফের মনে পড়ল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এক তুখোড় ছাত্রনেতার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হয়েছিল তার। আরিফের অসামান্য ধীশক্তি আর ব্যক্তিত্বের মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন তিনি। ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা করতেও এসেছেন। সবসময় 'আপনি' সম্বোধন করতেন আরিফকে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ছাত্রনেতাটি অতি অল্প বয়সে মন্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করেন। তার মন্ত্রীত্বলাভে খুবই খুশি হয়েছিল আরিফ। একদিন দেখা করতে গিয়েছিল তাঁর মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রী তাকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় বসিয়ে রেখে অবশেষে দেখা দিলেন এবং প্রথম সম্বোধনেই আরিফকে বিস্মিত করে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কি হে, কেমন আছ?' যেহেতু তিনি মন্ত্রী এবং ছোটবড় অসংখ্য মানুষের তোয়াজ পেতে অভ্যস্ত, সুতরাং যে-কাউকে 'তুমি' বলার অধিকার আছে তাঁর। আলাপ জমল না। মামুলি অভিনন্দন জানিয়ে আরিফ চলে এসেছে।

সামনে উপবিষ্ট দু'জন মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রাজকুমারবাবু নিবিষ্টমনে কয়েকটা ফাইল দেখলেন। তরপর যেন হঠাৎ মনে পড়ল, এমনভাবে বললেন, 'ও, হ্যাঁ, বল, তোমাদের কি চাই?'

আইরিনের গা জ্বলে গেল। কিছুক্ষণ আগেই পিওন তাকে জানিয়েছে, সাক্ষাৎপ্রার্থী কি চায়। আরিফ কিভাবে শুরু করবে, ভাবছে। ম্যানেজার আবার বললেন, 'চাকরি?'

'হ্যাঁ, স্যার।' আরিফ উত্তর দিল।

'চাকরি কোথায়?' রিভলভিং চেয়ারে একশো বিশ ডিগ্রি স্থূলকোণে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। 'চাকরির বাজার খুব মন্দা, বুঝলে?'

'কিন্তু, স্যার, শুনলাম, সুপারভাইজারের একটা পোস্ট খালি আছে।'

'কে বলল?' অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করে রাজকুমার সাহা রাজার মতই চেয়ারে দোল খান, এবং তারপর, যেন উত্তরের আশা করেননি, এমন ভঙ্গিতে বলেন, 'কি কাজ জান?'

'লোক চরাতে জানি, স্যার।'

'তাই নাকি?' সাহাবাবুকে এতক্ষণে ইন্টারেস্টেড মনে হল। 'লোক চরাতে জান আর না জান, কথা চরাতে জান বেশ। কোথায় কাজ করেছ আগে?'

'পাকিস্তান, ভারত আর নেপালে।'

চোখ পিটপিট করে তাকালেন এলিজাবেথ টি কোম্পানির ম্যানেজার।

আরিফ বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, কুলি-মজুর কন্ট্রাক্ট আর এক্স্-পোর্টের কাজ।'

'সার্টিফিকেট আছে?'

'আছে। কিন্তু সবগুলো হিন্দি আর উর্দু ভাষায় লেখা। বাংলাদেশে কোন কাজে লাগবে না, তাই সঙ্গে আনিনি।'

'হিন্দি আর উর্দু আমি বাংলার চেয়েও ভাল জানি। যাই হোক, সঙ্গে ওটা কে?'

'আমার স্ত্রী, স্যার।'

'স্ত্রী ?' চোখ কোঁচকালেন রাজকুমার সাহা। 'হানিমুন আর চাকরি খোঁজার কাজ একই সঙ্গে চালাচ্ছ, না ?'

'ইয়ে, স্যার, একটু অসুবিধায় পড়ে···'

'বড়লোকের এইসব পুতুল-পুতুল মেয়ের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছ, মিয়া। জীবনে আর কিছু করে উঠতে পারবে না, বুঝেছ ? আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় তোমাকে যে বেতন দেব, তাতে একার পেট চালানই দায়। পুতুলের খরচ জুটবে কোত্থেকে ?'

লজ্জায় আর অপমানে লাল হয়ে উঠল আইরিনের মুখ। এরকম পাঁচ-সাতটা এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি তার দয়ার ওপর নির্ভর করে। আর এ লোকটার কতখানি ধৃষ্টতা। সে আরিফের দিকে তাকাল। শক্ত, নির্বিকার মুখ। যেন কোনকিছুতেই তার কিছু যায় আসে না।

'একজনের রুজিতেই দু'জনের চলে যাবে, স্যার। মাথা গোঁজার মত ঠাঁই তো হবে !'

'ভাল কথা,' যেন আপদ দূর করতে পারলে বাঁচেন রাজকুমার সাহা। 'সপ্তাহে একশো পঁচাত্তর টাকা। বার ঘণ্টা ডিউটি। ওভারটাইম করতে পার ইচ্ছা করলে। ঘণ্টায় চার টাকা রেট। এক রুমের কোয়ার্টার পাবে কিন্তু কোন কমপ্লেন আমার কানে এলে মজা বুঝবে। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এলিজাবেথ ছড়ি পার করে দেব, বুঝেছ ?'

'বুঝলাম, স্যার,' অনুগত ভৃত্যের মত বলল আরিফ।

রাজকুমার হাঁক দিলেন, 'খালেক, বেঁচে আছিস ? না মরে-ছিস ?'

'আসছি, স্যার।' অর্ধসমাপ্ত ফিল্টার টিপড্ বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল পিওন।

'ডাকছিলেন, স্যার ?'

'ডাকিনি, একটা সালাম দিয়েছিলাম আপনাকে, হুজুর! থাকিস কোথায় ? এদেরকে নিয়ে যা। তিন নম্বর কোয়ার্টার খালি আছে, সেখানে এদের থাকার বন্দোবস্ত কর। লতিফ মিয়ার কাছে নিয়ে যা ওকে। কাজ বুঝিয়ে দেবে।'

কথা শেষ করে ফাইলে মন দিয়েছিলেন ম্যানেজার। হঠাৎ অগ্নিদৃষ্টিতে আরিফের দিকে তাকালেন। 'অ্যাই মিয়া, বাপ কোন নাম-টাম রেখেছিল তোমার ? সেটা গোপন করে ভাগছ কেন ?'

'ও, আমার নাম খয়ের উদ্দিন,' ঝটপট উত্তর দিল আরিফ, 'আমার স্ত্রীর নাম মোসাম্মাৎ সখিনা বানু।'

'তোমার স্ত্রীর নামে আমার আগ্রহ নেই। তবে দামী গাছের দামী ফল পেড়ে এনেছ, তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যাও, কাজ বুঝে নাও।'

বাইরে বেরিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খালেক। 'এই যে, এদিকে। উঁহু···ডানে···এবার বাঁয়ে···'

কোয়ার্টারে পৌঁছে আইরিনের চক্ষু চড়কগাছ। একে কোয়ার্টার বলে ? টিনের দোচালা একটা। তার দু'টো দরজা এবং একটা মাত্র জানালা। বহুকাল সেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না। মেঝের বহু জায়গায় সিমেন্ট উঠে গেছে, দু'চারটে ঘাসও গজিয়েছে। মনে হয়, কয়েক বছর ধরে পরিষ্কার করা হয়নি ঘরটা।

আইরিন বলতে যাচ্ছিল, 'এখানে থাকতে বলছ আমাকে?' কিন্তু তার আগেই আরিফ বলল, 'বাহ্, চমৎকার! দিব্যি চলে যাবে আমাদের। কিছু পানি, ডিটারজেন্ট আর ঝাঁটা খরচ হবে মাত্র। আরও কয়েকটা জিনিস দরকার হবে। দু'টো তোশক, দু'টো বালিশ, একটা বালতি, এইসব।'

'স্টোভ, হাঁড়ি-বাসন, ডাল-তেল-নুন-পেঁয়াজ, এসবও লাগবে,' দাবি পেশ করল আইরিন। কথা শেষ করল ইরেজিতে। 'এটা হোটেল হাওয়াই নয়, অর্ডার দেওয়ামাত্র খাবার রেডি পাওয়া যাবে না এখানে। পাওয়া গেলেও সদ্য চাকুরিপ্রাপ্ত সুপারভাই-জারের জন্যে সে বিলাসিতা অবিশ্বাস্য দেখাবে।'

'মেনে নিচ্ছি,' আরিফ বলল, 'সেই সঙ্গে এই মর্মে জ্ঞাত করাচ্ছি যে, অর্ধশিক্ষিত, বেকার খয়ের উদ্দিনের বউ সখিনা বানু এই যে ফড়ফড় করে ইংরেজি বলছে, এটাও অবিশ্বাস্য এবং সন্দেহজনক দেখাচ্ছে।'

খালেক বলল, 'কাজকাম বুঝে নিতে লতিফ মিয়ার কাছে যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চল।'

জানালাটা খুলে আইরিন আরিফের যাবার পথে তাকিয়ে থাকল। হাঁটার ধরন বদলে ফেলেছে লোকটা। কি ভয়ানক সচেতনতা! সে জানে, রোমে এলে কিভাবে রোমান হতে হয়। সে সাধারণ পলাতক অপরাধী নয়। দলছুট সৈনিক নয়। সন্ত্রাসবাদী নয়। তবে সে কি? কে সে? তার পোড়া মন এ কি সর্বনাশ করল? না জেনে না চিনে কার কাছে বাঁধা পড়ল

তার মন ?

কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। নোংরা, দুর্গন্ধময় ঘরের দিকে তাকিয়ে আইরিন চৌধুরীর বহু দিনের চর্চিত রুচিবোধ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই নোংরা পরিষ্কার করতে হবে তাকে। রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা লোকটার সঙ্গে সুখী দাম্পত্যের অভিনয় করতে হবে। তারপর ? এই উন্মত্ত স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে যদি ভেঙে যায় বালির প্রাসাদের মত ? যদি জানাজানি হয়ে যায় ইয়েলো ডিয়ারের সম্রাজ্ঞী আইরিন চৌধুরী এই অবস্থায় এক বিদেশীর সঙ্গে দিন ও রাত্রি যাপন করেছে ? কিভাবে মুখ দেখাবে সে তার সাতটা কোম্পানির কয়েক হাজার কর্মচারীর কাছে ? আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত মুখের কথা বাদই থাক। এভাবে চলতে পারে না। অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে হবে। আরিফ ফিরলে দ্রুত বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে। আরিফ যদি তাকে সব খুলে বলে, একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরুবে। প্রশাসনের বিশিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা আইরিন চৌধুরীর অনুরোধ ফেলতে পারবেন না। প্রয়োজনবোধে প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডির কাছে যাবে সে। প্রেসিডেন্ট তার ষষ্ঠ শিল্প কমপ্লেকস্ উদ্বোধনের সময় তার সাহসী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং যে কোন বিষয়ে সাহায্যের অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জাতির স্বার্থেই তাঁর সরকার এই একাকিনী শিল্প উদ্যোক্তা মহিলার সম্ভব সবরকম সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফার্স্ট লেডি তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, ব্যক্তিগত কোন সমস্যার ক্ষেত্রেও সম্ভব হলে

সাহায্য করবেন। আইরিন এখন তাদের সাহায্য চাইতে পারে। শুধু যদি জানতে পারে, আরিফের ব্যাপারটা বেআইনী নয়!

ঘরের ভেতরের গুমোট গরম তীব্রতর হয়ে উঠল। দরজাগুলো খুলে দিল আইরিন। সদর দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, ঘাড়ে তোশক নিয়ে হেঁটে আসছে আরিফ। নোংরা হবার ভয়ে জামা খুলে প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। কোথায় পেল নতুন তোশক? তোশকের নিচে দু'টো মাদুরও দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে তোশক আর মাদুরগুলো কাঁধ থেকে নামিয়ে দরজা বন্ধ করল আরিফ। তারপর রুমালে ঘাম মুছে এগিয়ে গেল আইরিনের কাছে। নোঙ্গি গায়ে তাকে সত্যিকারের পরিশ্রমী মানুষের মত দেখাচ্ছে।

আইরিন কিছু বলার সুযোগ পেল না। পুরুষের দুই হাতের বেষ্টনীতে তার শরীর সহসা বন্দী হল।

'এই মুহূর্তটির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি, তামান্না।'

আরিফের এই অকপট স্বীকারোক্তি আইরিনের সমস্ত অস্তিত্বে হঠাৎ ঝড় তুলল। থরথর করে কেঁপে উঠল সে। কিছু বলতে চেয়েছিল, পারল না। তার অধরোষ্ঠের ওপর প্রিয় পুরুষের আবেগঘন নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করল।

আইরিন সবকিছু ভুলে গেল। তার মনে রইল না, একজন অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের বিপজ্জনক, ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সঙ্গে বোকার মত নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে। নাম পাল্টাতে হয়েছে। আশ্রয় নিতে হয়েছে চা-বাগানের কর্মচারীদের বস্তিতে। এমন

নোংরা জায়গায় পা দেবার কথা সে কখনও ভাবেনি।

ক্রমেই আরিফের শক্তিশালী বাহুবন্ধনে, চুম্বনবন্দী অবস্থায় সে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যেতে থাকল। সেখানে সোনালি কামনার বর্ধিষ্ণু শিখা ছাড়া আর কোন উত্তাপ নেই। ভালবাসা ছাড়া আর কোন গান নেই। জাজ্বল্যমান আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন গন্ধ নেই।

সে তার বিলীয়মান সত্তাকে বালুবেলার রূপে দেখতে পেল, যেখানে পুরুষের অফুরন্ত চুম্বন ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে তার অনুভবের কূলে।

'ভালবাসি।' কথাটি অসংখ্যবার উচ্চারণ করল আরিফ প্রতিটি চুম্বনের বিরতিতে।

'তোমার মধ্যে আমি হঠাৎ নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছি। জানি না, তোমাকে না পেলে কি হবে আমার। এক মুহূর্তও তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারছি না।' আইরিনের কপালে, কানের লতিতে, গলায় চুমু খেতে খেতে বলল আরিফ।

আইরিনের দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ভালবাসার এই উচ্ছ্বাস, এই প্রাবল্য এবং এই সর্বগ্রাসী চরিত্রের কথা তার জানা ছিল না। অবশেষে সে তার স্বপ্নে দেখা ভালবাসা আর ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছে। বরফ ঢাকা পাহাড় আর সবুজ বনের বুক চিরে নেমে আসা ঝর্ণার মত মনোহর, ভয়ংকর আর বিস্ময়কর এক ভালবাসা। নদীর প্লাবনের মত এক ভালবাসা। শরতের মেঘ ধোয়া জোছনার মত স্বপ্নময় এক ভালবাসা।

অতিকষ্টে উচ্চারণ করল আইরিন, 'আমিও ভালবেসে ফেলেছি তোমায়। নিজের অজান্তে মনপাখি তোমার খাঁচায় পুরে দিয়েছি। আমারও আর কোন সম্বল নেই তুমি ছাড়া। আমিও জানি না, আমার কি হবে!'

'আবার বল, 'ভালবাসি'।' মিনতি করল আরিফ। ওর ঠোঁটের কোণে মাদকতাময় হাসি।

আইরিন আরিফের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, 'ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি।'

আরিফ হাসল। ভারি সুখী আর তৃপ্ত দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'খুবই মিষ্টি মেয়ে তুমি। এত চমৎকার বিভঙ্গ তোমার শরীরে! নাকটা তো রীতিমতো পাগল করেছে আমাকে। আল্লা নিশ্চয়ই ছুটির দিনে বসে বানিয়েছিলেন তোমাকে।'

আইরিন আরিফের মাথা সজোরে নিজের বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলল, 'আরও বল, শুনতে ভীষণ ভাল লাগছে আমার।'

'এখন নয়, লক্ষ্মী মেয়ে! কাজ আছে।'

'আজকেই কিসের কাজ?' আদুরে গলায় বলল আইরিন। 'আমায় ফেলে যেও না!'

'আমার ইমিডিয়েট বস্ লতিফ মিয়া অপেক্ষা করছেন। আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন, তোশক-বালিশ কিনে ঘরে রেখে আসবার জন্যে।'

'কিন্তু, আরিফ, আমাদের জরুরী আলোচনা দরকার। আমরা···'

'বেশি দেরি হবে না। শুধু কয়েকটা বিষয় বুঝে নেব। দারোয়ানের মেয়েটাকে ডাকলে পাবে। ওকে দিয়ে জরুরী কেনাকাটার

কাজ করাতে পার। নিজে বাইরে যেও না।'

'তোশক-বালিশ কোত্থেকে কিনেছ?'

'গার্ডেনের নিজস্ব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে দুই নম্বর গেটের কাছে। ওখান থেকে কিনেছি। ওটা চালান খোদ ম্যানেজারের স্ত্রী—মিনতি রাণী সাহা। ওখানে যেতে পার তুমি। একটু বেশি কথা বললেও মহিলার মনটা ভাল। দরকারী জিনিস জোগাড় করতে শুরু কর। এখানে টাকা রইল। আমি ফিরে এসে ঘর পরিষ্কারের কাজে হাত দেব।'

কিন্তু আরিফ চলে যেতেই আইরিন অনুভব করল, সে হেরে গেছে। বিনা যুদ্ধে জিতে গেছে আরিফ। এখন আর দেরি করে লাভ নেই। আইরিন জানে, আরিফ ফিরে আসার আগেই ঘরটা পরিষ্কারের কাজ শেষ করবে সে নিজেই।

জানালায় প্রতিবেশিনীর মুখ দেখা গেল। কোলে ছেলে। আইরিন জিজ্ঞেস করল, 'পানি কোথায় পাব, বলতে পারেন?'

দারোয়ানের মেয়ে নিনি যথেষ্ট সাহায্য করল তাকে। তা সত্ত্বেও সন্ধ্যে নাগাদ সবকিছু পরিষ্কার করে বিছানা পেতে সে যখন রান্নার জন্য স্টোভ ধরাল, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল। কিন্তু তার পুরুষমানুষটি বাইরে থেকে ফিরে এসে ঝকঝকে, তকতকে ঘর দেখবে, আনন্দিত হবে, এই অনুভব স্বস্তি দিল তাকে।

নিনি গেটের বাইরের দোকান থেকে তেল আর লবণ আনতে গিয়েছিল। সেগুলো নামিয়ে রেখে ফ্রকে হাত মুছল সে। 'খালা,

এই যে আপনার ফেরত টাকা। সাত টাকা পঁচিশ পয়সা।'

'ওগুলো তুমি রেখে দাও, সোনা!' সস্নেহে বলল আইরিন। মেয়েটা অন্তত ছয় বার দোকানে গেছে তার নতুন সংসারের অগুণতি প্রয়োজন মেটাবার কাজে।

মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল আইরিন। 'কি? কিছু বলবে?'

'খালা, বাইরের দরজা সবসময় বন্ধ রাখবেন,' ফিসফিস করে বলল নিনি। 'ম্যানেজার সাহেবের ছেলে, অলক সাহা, খুব খারাপ লোক।'

'তাই নাকি?' কৌতুকের সুরে বলল আইরিন।

'হ্যাঁ, খালা, আমি আসার সময় দেখলাম, সে বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে চলে গেল।'

চিন্তিত মনে হল আইরিনকে।

'আর একটা কথা, খালা, আমরা ছোট মানুষ। আমাদের এত বকশিশ দেবেন না। এক টাকা কিংবা দু'টাকা দেবেন। নইলে সবাই বেশি দাবি করতে শুরু করবে। তখন বকশিশ দিতে দিতেই ফতুর হয়ে যাবেন।'

নিনির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আইরিন। 'তুমি তো অনেক-কিছু বোঝ! বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোন ক্লাসে পড় তুমি?'

'ক্লাস!' আকাশ থেকে পড়ল নিনি। কথাটা তার মাথায় ঢুকছে না।

'তুমি স্কুলে যাও না?'

'না তো! স্কুল একটা আছে, এখান থেকে তিন মাইল দূরে। কোন কোন ছেলে যায় এলিজাবেথ কলোনি থেকে। মেয়েদেরকে যেতে দেয় না।'

বিস্ময়াহত মুখে তাকিয়ে থাকল আইরিন। কোনদিন সুযোগ হলে নিনিদের জন্যে এখানে একটা স্কুল বানাবে সে, স্থির করল।

তার রান্না সংক্ষিপ্ত। ভাত, ডাল এবং কপি দিয়ে খাসির মাংসের তরকারি। কদাচিৎ সখের রান্না রেঁধেছে আইরিন। সবকিছু ঠিকমত মনে নেই। রাঁধতে বসে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রান্না শেষ করল সে এবং স্বাদ নিয়ে দেখল, খুব খারাপ হয়নি, খাওয়া যাবে।

তিথির কথা মনে পড়ল তার। তিথি প্রায়ই তাকে বলেছে, 'আপা, ইংল্যাণ্ডের রানীকেও রান্না জানতে হয়। কিছু রান্না শিখে রাখুন, কাজে লাগবে।'

একবার পিকনিকে গিয়ে সামান্য রান্না করেছিল আইরিন। ওস্তাদ ছিল তিথিই। রান্না শেষ হলে গম্ভীর মুখে মন্তব্য করেছিল সে, 'একটু মন দিলেই আপনি ভাল রাঁধবেন, আপা।'

আজ সে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছে লবণ, তেল, মশলার সঙ্গে। তবুও তা খাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে।

খাওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। হ্যারিকেনের সলতে নামিয়ে আলোটা প্রায় নিবুনিবু করে দিল সে। তারপর দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল।

'আজ সেই দিন,' মনে মনে বলল আইরিন। 'সখিনা বানু

আর তামান্না হকের খোলস ছেড়ে আইরিন চৌধুরী আত্মপ্রকাশ করবে আজ প্রিয়তম পুরুষের সামনে। পুরুষটিও আজ তার পরিচয় প্রকাশ করবে। না করলে বাধ্য করা হবে তাকে।'

কোনদিক থেকে এল, কে জানে। আইরিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরিফের বাহুবন্ধনে বন্দী হল আইরিন। শক্ত আলিঙ্গন।

'অ্যাই, কি অসভ্য তুমি? খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এ কি করছ?'

'অন্ধকার। কেউ দেখতে পাচ্ছে না।'

'উঁহুঁ।'

'ঘর অন্ধকার করে দরজায় অমন মোহনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ তুমি। জানই তো, আ হ্যাংরি ম্যান ইজ অ্যান অ্যাংরি ম্যান।'

'অ্যাই, ছাড়, ঘরে চল।'

নিজের কথায় নিজেই অবাক হয়ে গেল আইরিন। কত সহজে সে বলল, 'ঘরে চল।' সে ভেবে পেল না, নারীর কাছে তবে ঘরের চেয়েও আসল জিনিস তার ঘরের মানুষটি! তার ঘরই নারীর ঘর!

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আলোর শিখা উস্কে দিল আইরিন।

চোখ কপালে তুলে আরিফ বলল, 'এসব কি করেছ তুমি? নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না। আই জাস্ট ডোন্ট বিলিভ। ভেবেছিলাম এখন তোমার সঙ্গে ধোয়ামোছার কাজে হাত লাগাব। এত কাজ কিভাবে সম্ভব হল, শুনি?'

'তেমন কোন কাজই নয় এগুলো।' জড়িত কণ্ঠে বলল আই-

রিন। 'হাতমুখ ধোও। খাবার রেডি।'

আইরিনকে জাপটে ধরে আরিফ বলল, 'কি বলছ?'

পুনরাবৃত্তি করল আইরিন।

সাত

খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল আরিফ। প্লেট সরিয়ে রেখে বলল, 'চমৎকার রেঁধেছ। তোমার রান্নার হাত এত ভাল, ভাবতেই পারিনি।'

আইরিন বলল, 'অপমান করছ তুমি আমাকে। আমাকে দেখে কি মনে হয়? রাঁধতে জানি না? অকম্মা, ধনীর দুলালী?'

'ঠিক তা নয়,' ব্যাখ্যা করল আরিফ, 'কিন্তু তোমার হাতদুটো দেখে মনে হয় যে, তুমি রান্নাঘরের ধারে কাছেও যাও না।'

'হাতদুটো খুব ভাল অবস্থায় নেই এই মুহূর্তে। তিনটে নখ ভেঙেছে। সাবানের ক্ষারে কয়েক জায়গায় চামড়া উঠে গেছে। নিনি এখানকার দোকান থেকে যে সাবান এনে দিয়েছে তাতে কার্বলিক এসিড ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'তাই বল! এ জন্যেই সারা ঘরে হাসপাতালের গন্ধ করছে।' ঠাট্টা করে বলল আরিফ।

'ও কথা বল না। আজকের এই কাজটুকু শেষ করে যত তৃপ্তি পেয়েছি আর গর্ব অনুভব করেছি, আর কখনও কোন কাজ করে

সেরকম মনে হয়নি।'

কিন্তু কথাটা বলেই আইরিন বুঝতে পারল, নিজের কথার প্যাঁচে সে নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী সুরে বলল আরিফ, 'যতদূর মনে পড়ে, তুমি একা থাক বলে জানিয়েছ। তাহলে তোমার ঘরের কাজ কে করে? ফুলটাইম দাসদাসী আছে নাকি?'

আইরিন গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। 'ইয়েলো ডিয়ার গ্রুপ অভ কোম্পানিজ-এর সেক্রেটারির অন্তত দু'জন কাজের লোক রাখার সামর্থ্য আছে।'

ঘরের কোণে এঁটো বাসনপত্র রেখে ফিরে এসে আইরিন দেখল, আরিফ কৌতুকের দৃষ্টিতে বিছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। দুই বিপরীত দিকের দেয়াল ঘেঁষে দু'টো বিছানা, মাঝখানে ছ'ফুট ব্যবধান। যেন খুব মজা পাচ্ছে, এমনভাবে হাসছে সে।

'হাসছ কেন?'

'একটাই ঘর। একটাই ছাদ। দু'জন মানুষ। দুটো বিছানার মধ্যে ছয় ফুট ব্যবধান রাখা আর না রাখার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, তাই ভাবছি। অবশ্য, কথা দিতে পারি, আজ তোমাকে বিরক্ত করব না। আজ এত ক্লান্ত আমি, তোমাকে বিরক্ত করার এনার্জি-টুকুও অবশিষ্ট নেই।'

আইরিনের গালে রক্ত জমল। আপেলের চেহারা ধরল তার গাল দু'টো।

'আমার ধারণা ছিল, তুমি আউট অ্যাণ্ড আউট একজন ভদ্রলোক।'

আরিফ হাসল। 'ভদ্রলোকেরা সবাই নারী সংস্পর্শ থেকে সর্বদা ছ'ফুট দূরে থাকে নাকি?'

আইরিন বলল, 'নিজস্ব নারী ছাড়া অন্য সব নারী থেকে ছ'ফুট কেন, ছ'মাইলেরও বেশি দূরে থাকে।'

'এগুলো ভিক্টোরিয়ান যুগের মেলোড্রামা। বাস্তব অবস্থা হল, ভালবাসা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার জন্যে অপেক্ষা করে না।'

'আরিফ,' আইরিনের স্বরে রাগ স্পষ্ট হল। 'এভাবে কথা বললে অন্ধকারের মধ্যেই যেদিকে দু'চোখ যায়, রওনা দেব আমি।'

'লক্ষ্মী মেয়ে, রাগ কর না।' আরিফের গলার স্বর ভারি হয়ে হয়ে এল। 'তুমি চাও না, এমন কিছুই আমি করব না। কখনই না। ছ'ফুট ব্যবধান কমে ছ'ইঞ্চি হলেও আমার দ্বারা তুমি অপমানিত হবে না। আমার ভুলে তো নয়ই, এমনকি তোমার ভুলেও না। আমার ভালবাসা পাখির পালকের মত হালকা নয়। হিমালয় পাহাড়ের মত ভারী।'

আইরিন আরিফের কাছে এসে দু'হাতে তার মুখ তুলে ধরল। 'আমি জানি।'

'আরও কাছে এস,' আইরিনের হাত ধরে টানল আরিফ, 'তোমার কানে কানে আমায় বলতে দাও, আমি তোমায় ভালবাসি। একবার। দুইবার। তিনবার।'

'এত অল্প সময়ে এত গভীরভাবে কি করে ভালবাসলে, আরিফ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আইরিন।

'যে চোখ ভালবাসতে জানে, সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের

প্রিয়জনকে খুঁজে নিতে পারে॥ যে চোখ ভালবাসতে জানে না, বছরের পর বছর ধরে খুঁজেও ভালবাসার মুখটির দেখা পায় না সে।'

'দারুণ সত্যি কথা বলেছ তুমি। আমি আমার বাকি জীবনের জন্যে তোমাকে খুঁজে পেয়েছি এবং হারাতে চাই না একটুও।'

'কিন্তু আমার একটি ভয় আছে, লক্ষ্মীসোনা, আমার পরিচয় আর কাহিনী শুনলে হয়ত তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। জানি না, সত্যি কতটুকু ভালবেসেছ। জানি না, কেবল ছুটি কাটাবার অন্য দশটা উপকরণের মত আমার সঙ্গ গ্রহণ করেছ কিনা।'

আরিফের বুকে আছড়ে পড়ল আইরিন। কেঁদে ফেলল। 'কেন বিশ্বাস করছ না তুমি? তোমার সমুদ্রে আমার নৌকাডুবি হয়ে গেছে। এখন তুমিই জীবন, তুমিই মৃত্যু। ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে আমার। তোমার পরিচয়ের শুভাশুভ তাকে আর পাল-টাতে পারে না।'

'ভালভাবে ভেবে দেখেছ? আমার কিছুই তো জান না তুমি। আমি দাগী আসামী হতে পারি। জেল পালান কয়েদী হতে পারি, হতে পারি মাফিয়ার লোক। কুখ্যাত স্মাগলার। অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী, ধরা পড়লেই দশ বছরের জন্যে চোদ্দশিকের ঘরে ঢুকতে পারি, এমন।'

'কিছুই আসে যায় না।' শান্ত চোখে আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল আইরিন। 'যে পরিচয় দাও, যে ঘটনাই শোনাও, আমি তোমায় ভালবাসব। চিরদিন। আই ডোণ্ট কেয়ার হোয়াট

ইউ'ভ্ ডান। বরং চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচাতে। দেশের সর্বোচ্চ মহলে আমার কিছু যোগাযোগ আছে। যে কোন সাহায্য, যদি তোমার কাজে লাগে, আদায় করতে পারি আমি। এমন কোথাও আশ্রয় পেতে পারি আমরা যেখানে তোমার শত্রুরা কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না। তারপর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে একসময়।'

আইরিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল আরিফ। 'তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস। অনেক প্রমাণ পেয়েছি। কেবল একটা পরীক্ষা বাকি। একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল আইরিন, 'কি প্রশ্ন?'

'ভালবাসার স্বার্থে আমার সঙ্গে এমন কোথাও যেতে রাজি আছ তুমি, যেখানে যেতে হলে তোমার সব কিছু ত্যাগ করে যেতে হবে?'

'রাজি।'

'এই বাংলাদেশ, ঢাকা শহর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব··· সবকিছু?'

'হ্যাঁ, এরচেয়ে বড় কিছু থাকলে, তা-ও।'

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। টোকা পড়ল দরজায়।

'কে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আইরিন।

'আমি খালেক। স্যার আছেন নাকি?'

দরজা খুলে বাইরে এল আরিফ।

'লতিফ স্যার পাঠিয়েছেন আমাকে। উনি কাল খুব সকালে কেলাসটিলা যাবেন। আপনাকে চার্জ দিয়ে যেতে চান, তাই

এখনই একবার যেতে বলেছেন। বেশি সময় লাগবে না। আধ-ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি আসছি।'

আরিফ ঘরে ঢুকে শার্ট গায়ে দিল। আইরিন পথরোধ করল তার।

'যেও না, আরিফ, আমার ভয় করে।'

'ভয়ের কিছু নেই। দরজা খুলবে না আমি না আসা পর্যন্ত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব আমি। তারপর কথা বলব তোমার সঙ্গে। আমার সমস্ত কথা।'

আইরিনের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। আরিফ তার কথা বলবে! তার পরিচয় দেবে। বলবে তার সব ঘটনা! কে সে? কি তার ঘটনা?

আরিফ বেরিয়ে গেল। আইরিন বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকল তার চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে। ধ্যানমগ্ন। ভুলে গেছে দরজা বন্ধ করার কথা।

হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল বাইশ-তেইশ বছরের একটা ছেলে। কাপড়চোপড় দেখে মনে হয়, যা চায়, তা-ই পেতে অভ্যস্ত সে। সরু, কিন্তু শক্তসমর্থ শরীর। গোঁফ-দাড়ি কামায় না। কোমরে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে আইরিনের তিন ফুট ব্যবধানে। আইরিন ভীষণ চমকে উঠল।

'কে আপনি?'

'আপনাদেরই একজন,' পরিহাস-তরল উত্তর এল ওদিক থেকে। 'আমার বাবা এই গার্ডেনের ম্যানেজার।'

'ও, তুমিই তাহলে অলক সাহা ?'

'বাহ্, আমার নামটাও জানেন দেখছি! আমার বাপের আরও তিনটে ছেলে আছে। কিন্তু অলক সাহা সবচেয়ে ভাগ্যবান। সুন্দরী নারীগণ কেবল তাকেই চেনেন।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আইরিনের। 'মুখ সামলে কথা বল, বেয়াদব ছেলে! আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। তোমার বড় বোনের মত।'

'হা হা হা! হাসালেন, ভাবী। আমার প্রিয় রমণীকুলের প্রায় সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়। কেউ কেউ মা-খালার বয়সী। কিছু যায় আসে না তাতে। আপনার স্বামী আপনার বড় ভাইয়ের বয়সী নন? অনেক মেয়ের স্বামী তার পিতার বয়সী। তাতে কি হল?'

'কি চাও তুমি?'

'আপনি আমার সঙ্গে রেগে রেগে কথা বলছেন কেন? আপনার রূপ আর গুণের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে এলিজাবেথ রাজ্যে। খুব লোভ হল আলাপ করতে। তাই এলাম।'

'আমার স্বামীর উপস্থিতিতে এস।'

'আপনার স্বামী···সন্দেহ আছে আমার, সত্যিই স্বামী কিনা··· তার সাথে কোন দরকার নেই আমার। আমার দরকার আপনার সাথেই।'

শিউরে উঠল আইরিন। বলে কি ছোকরা?

'কিসে সন্দেহ হল?'

'অলক সাহা এত কৈফিয়ত দিতে ভালবাসে না, তবু আপনার

খাতিরে বলছি। প্রথমত, আপনার চোখেমুখে এই যে ডগমগ একটা জেল্লাভাব, বিয়ের পরে এটা মেয়েদের মুখ থেকে উড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, নতুন-বিয়ে-হওয়া নারী স্বামীর জন্যে আলাদা বিছানা পাতে না। সন্ধ্যেবেলা ভাব জমানোর আশায় একবার চান্স নিয়েছিলাম। উঁকি দিয়ে দেখি, ব্যাপার খুব সুবিধার না। কি ব্যাপার? অলক সাহাকে বিশ্বাস করতে পারেন। লম্পট হলেও তার অনেক গুড কোয়ালিটি আছে। লোকের গোপন কথা গোপন রাখতে জানে।'

'তোমার গোয়েন্দাগিরির প্রতিভায় আমি মুগ্ধ। দয়া করে বিরক্ত না করে কেটে পড়। আমার স্বামী ফিরলে তখন এস। ব্যাপার আর যাই হোক, তোমার জন্যে সুবিধেজনক নয়।'

অলক সাহা গোটা তল্লাটে ত্রাসের উপমা। বিশেষ করে মেয়েরা তাকে যমের মত ভয় পায়। রাসপুতিনের মত জাদু জানে অলক সাহা। কিন্তু এই প্রথমবার কোন রমণীর সামনে একটু থমকে গেল সে। সখিনা বানু খুব সাধারণ মেয়ে নয়। এর সঙ্গে খুব সাবধানে ডিল করতে হবে, বুঝতে পারল অলক সাহা।

'খেপছেন কেন? নতুন এসেছেন আপনারা। আপনাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব তো আমি অস্বীকার করতে পারি না! ভদ্রতার খাতিরে ঘরে গিয়ে বসতেও বললেন না একবার! যাই হোক, কাল আবার আসব। আপনার স্বামী দেবতার উপস্থিতিতেই আসব। কোন দরকার থাকলে বলবেন। এখন চলি।'

দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আইরিন। নতুন উপদ্রব এটা।

এই ক্ষুদে ক্ষমতাধর মানুষগুলো এভাবেই তাদের সমাজে ক্ষমতা ভোগদখল করে! মানুষ নির্বিবাদে সেটা মেনেও নেয়। না নিয়ে হয়ত উপায় নেই তাদের। নিনির মা-কিংবা বড়বোনেরা নিশ্চয়ই এই ছেলেটির লিপ্সার শিকার হয়েছে কোন না কোনভাবে, কখনও না কখনও। কিন্তু প্রতিবাদ করে দেখেছে কোন সময়? কেন করে না? ওদেরও কোন বিশেষ দুর্বলতা নেই তো!

বিছানায় শুয়ে পড়তেই গভীর ঘুমের ভেতরে তলিয়ে গেল দুইদিনের সীমাহীন দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আইরিন। সে জানে না, কখন আরিফ এসে অজস্র ডাকাডাকির পর ঘুম ভাঙিয়েছে তার। ঘুমের ঘোরেই সে দরজা খুলেছে এবং শুয়ে পড়েছে আবার। এমনকি, পরদিন সকালে কখন ঘুম থেকে উঠে আরিফ ডিউটিতে চলে গেছে, তা-ও জানে না আইরিন।

আটটার দিকে নিনি এসে তার ঘুম ভাঙাল।

'সখিনা খালা, ও সখিনা খালা, উঠবেন না?'

ধড়মড় করে উঠে বসল আইরিন। স্থানকাল ভুল হয়ে গিয়েছিল তার। আর একটু হলেই নিনির সামনে সিন ক্রিয়েট করতে যাচ্ছিল। আধোঘুমে, আধোজাগরণে বিছানার পাশে টেলিফোন সেট খুঁজছিল সে হাজিরনকে ডাকার জন্যে।

সকালের নাশ্‌তা বানানোর জন্যে ডিম আর আটা আনিয়ে রেখেছিল। অথচ কিছু না খেয়েই ডিউটিতে চলে গেছে আরিফ, ভেবে লজ্জা আর অপরাধবোধে মুষড়ে পড়ল আইরিন। মড়ার মত ঘুমিয়েছে সে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি, আরিফের কথাগুলো

শোনা হয়নি তার।

ছটফট করে উঠল আইরিন। কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে। জানা হচ্ছে না, কার খাঁচায় মন তুলে দিয়ে দেউলিয়া হয়েছে সে? কোন দেশে বাড়ি তার? কি করে সে? কেন তাকে খুন করার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কিছু লোক?

নাশ্‌তা বানাল বটে, কিন্তু মুখে রুচল না আইরিনের। পুরুষ লোকটি, যে খালি পেটে ডিউটিতে গেছে, তার কথা মনে হতেই হাত গুটিয়ে উঠে পড়ল সে।

নিনি এসে ডাকল, 'সখিনা খালা, মন খারাপ করছেন কেন? বাড়ির জন্যে চিন্তা হচ্ছে? চলেন আমাদের বাসায়। মা'র সঙ্গে গল্প করবেন। ভাল লাগবে।'

নিনির মা'র সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করতে ভাল লাগল না তার। দরিদ্র পরিবারের সেই একঘেয়ে অভিযোগ। আইরিন বেশ কয়েকটা সমাজসেবা সমিতির সঙ্গে যুক্ত। এসব সমিতির নানা প্রকল্পে কর্মরত দুঃস্থা মেয়েদের অভাব অভিযোগের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছে সে। কিন্তু সর্বত্রই একই চিত্র। দারিদ্র্যের সমস্ত কারণ নাকি মাত্র দু'টো। যারা ভাগ্যে বিশ্বাসী তারা ভাগ্যকে একমাত্র ঠাউরে বসে আছে, আর তাদের ধারণা, ধনীর করুণা তাদের পাওনা। অন্য কিছু মানুষ—তাদের সংখ্যা খুবই কম মনে করে, তাদের দারিদ্র্য এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত দুর্ভোগের একমাত্র কারণ আইরিন চৌধুরীর মত কয়েকজন ব্যক্তি। পানি আরও ঘোলা হতে বাকি। সুযোগ আসবেই। তারা দেখে নেবে আইরিন চৌধুরীদের।

এলিজাবেথ কলোনি, অর্থাৎ এলিজাবেথ টি-গার্ডেনের শ্রমিক ও কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা পরিদর্শন করল সে একজন কর্মচারীর স্ত্রী হিসেবে। সে ভেবে পেল না, এক রুমের এই আবাসিক ভবনে মানুষ কিভাবে প্রতিদিনের সমস্ত কাজ সম্পাদন করে সপরিবারে বসবাস করতে পারে? এক-একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যাও কম নয়। নিনির মায়ের পাঁচ সন্তান। রান্না হচ্ছে ঘরের এক কোণে। তার পাশে গাদা করা বিছানাপত্র। চায়ের খালি পেটি। কলার খোসা, মুরগীর বিষ্ঠা ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। তার মাঝেই ঘুমিয়ে আছে শিশু। এভাবেই সংসারধর্ম চলছে মানুষের। বংশবৃদ্ধির কাজটিও থেমে নেই।

তাদের এই জীবনে অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু সে অভিযোগ প্রকাশের জন্যে মাসে দু'টাকা দণ্ড দিতে হয় তাদের। একটা ইউনিয়ন আছে। আদায়কৃত চাঁদায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন ইউনিয়নের সেই সব শহুরে নেতারা, যারা ভুলেও কখনও এলিজাবেথ কলোনিতে পা দেননি।

এই দুঃস্বপ্ন থেকে কবে, কখন, কিভাবে মুক্তি মিলবে আইরিন জানে না। মুক্তি পেলে সে এই হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্যে কিছু করতে চেষ্টা করত। অন্তত নিনিকে স্কুলে পাঠাতে পারাও একটা বড় কাজ হবে।

কেনাকাটার জন্যে শ্রীমতি সাহার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ছুটতে হল তাকে। ক্রেতা-সমাগমে মুখর একটা বড় দোকান আশা করেছিল সে। নিরাশ হল। ছোট্ট একটা ঘরে কয়েকটা আলমারির সামনে চেয়ার টেবিল পেতে বসে আছেন মিসেস

সাহা। স্বামীর কাছাকাছি বয়স। কিন্তু সুগঠিত শরীরের জন্যে তার বয়স অনেক কম মনে হয়।

মিসেস সাহা উল বুনছিলেন। আগন্তুকের মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'এখন ভিড় কর না, বাপু। বউনি হয়নি। এরকম চললে দোকান তুলে দিতে হবে।'

গলা খাঁকারি দিয়ে আইরিন বলল, 'ইয়ে, আমি এসেছিলাম কয়েকটা…'

ক্রেতার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলার আচরণ পালটে গেল। 'ও, তুমি? এস, এস। কাল তোমার স্বামী এসেছিল। ঐ নতুন সুপারভাইজারটা তোমার স্বামী নয়? দু'টো তোশক আর বালিশ কিনেছে নগদ পয়সায়। কাজের লোক বটে তোমার মরদ। পয়সার মায়া করে না। করবেই বা কেন? এই বয়সটাই তো দু'হাতে আয় করার, আর দু'হাতে খরচ করার।'

আইরিন নিজে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পছন্দ করে না। কিন্তু সে শুরু না করলে অন্য পক্ষের বিরামহীন বকবকানি শুনে যেতে হবে, এই ভয়ে স্থির করল, অফেন্সই এখানে সবচেয়ে ভাল ডিফেন্স।

'কই? শুনলাম আপনার বিরাট বড় দোকান।'

'ঠিকই শুনেছ, বাছা, দোকান অনেক বড়। ঐ চাটগাঁ-ঢাকার বড় বড় সওদাগরদের দোকানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু সবকিছু সামনে সাজিয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা কেবল শো-কেসের মর্যাদাই বোঝে। দামের খবর রাখে না। শো-কেস ভর্তি জিনিস দেখলেই ওদের

মাথা খারাপ। এত বিক্রি করছ, লাভ করছ, ভাগ দেবে না কেন? আর শো-কেস ফাঁকা করে গুদামে মাল লুকিয়ে রাখ, ব্যাস, তারা ঠাণ্ডা। খাতির করে বসিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় খেতে দাও, আরও ঠাণ্ডা।'

'আপনার ব্যবসা তাহলে ভালই চলছে, কি বলেন?'

'আর বল না, কেবল বাকি আর বাকি! লাখটাকার মাল। খাতায় আছে। পকেটে নেই। এই ছোটলোকের সমাজে মানুষ এসব কারবারে হাত দেয়? তোমরা তো দেখছি ওদের মত নও। তোমাদেরকে তাই মনের কথা বলি। বাড়ি কোথায়?'

'লক্ষ্মীপুর। আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছে। খুব হঠাৎ করে। ওনার চাকরি-বাকরি ছিল না। তাই কিছুই কেনাকাটা করা হয়নি। এখন সব জিনিস কিনতে হচ্ছে। সংসারটা তো গোছাতে হবে!'

'ভাল, খুব ভাল। সংসার গুছিয়ে নিতে হয় সবার আগে। নইলে পুরুষ মানুষের মনে শান্তি আসে না। কাজে মন দিতে পারে না। কাজ ভালমত না করলে আয় হবে কি করে, অ্যাঁ? মেয়েদের, বাপু, অনেক বেশি দায়িত্ব। তা, কি কি লাগবে, বল।'

'দু'টো ব্লাউজ আর দু'টো শাড়ি দরকার আমার। ওনার জন্যে দু'টো লুঙ্গি। তা ছাড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর লংক্লথের পাজামা চাই। বাসার জন্যে…'

বিস্মিত মিসেস সাহা একটার পর একটা জিনিস আনতে শুরু করলেন ভেতরের স্টোররুম থেকে। মাপ মেলালেন। দামদর বললেন। হিসাব লিখলেন। সবশেষে প্যাকেটে মুড়ে একজায়-

গায় রাখতে শুরু করলেন।

কেনাকাটা শেষ হলে আইরিন জিনিসপত্রের পরিমাণ দেখে ঘাবড়ে গেল। এত দূরের পথে এত জিনিস সে একলা বয়ে নিতে পারবে না। ভুল হয়ে গেছে, নিনিকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল, ভাবল সে।

মিসেস সাহা উপায় বাতলে দিলেন। 'এক কাজ কর। এগুলো বস্তায় বাঁধা থাক। এক্ষুণি আমার ছেলে আসবে। ও পৌঁছে দেবে বস্তাটা। তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘরে যাও।'

'কোন দরকার নেই, আমি কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল আইরিন। কিন্তু প্রতিবাদে কাজ হল না।

বাসায় ফিরে আসার মিনিট দশেকের মধ্যেই আইরিনের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করে অলক সাহা দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে সরে দাঁড়াল আইরিন। অলক বস্তা নামিয়ে রেখে সহজ কণ্ঠে বলল, 'বকশিশ দিন, ভাবী।'

'তুমি আমাদের মনিবের ছেলে। তুমি তো বকশিশের ঊর্ধ্বে, ভাই! যাই হোক, কত দিলে খুশি হও!'

'টাকায় বকশিশ নিই না আমি।' দ্রুত আইরিনের দিকে এগিয়ে গেল সে। চোখে আগুন জ্বলছে তার। ভয়ংকর হাঁপাচ্ছে।

আইরিন প্রস্তুত ছিল। এক লাফে দরজা, দরজা পার হয়ে একেবারে সদর প্রাঙ্গণে।

'আপনি, ভাবী, নেহাত বেরসিক। একটু ঠাট্টাও বোঝেন না। রসিকতাও বোঝেন না।' ফিসফিস করে বলল অলক। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ দমনের চেষ্টা করছে সে।

'যে কোন মুহূর্তে আমার স্বামী ফিরে আসবেন। একেবারে খুন করে ফেলবেন সন্দেহজনক কিছু দেখলে। খুবই ভয়ঙ্কারাস লোক! আর কখনও এ ধরনের কিছু করার চেষ্টা কর না।'

'আচ্ছা, বেশ।' বিষাক্ত হাসি হাসতে হাসতে দ্বিতীয়বারের মত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল অলক সাহা।

আরিফ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরল। দরজা বন্ধ করে উদ্‌-ভ্রান্তের মত আইরিনকে জাপটে ধরে তার ঠোঁট দখল করল। নিঃশেষে পান করল তার অধরসুধা।

অতি কষ্টে নিজেকে আরিফের বেষ্টনীমুক্ত করল আইরিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ছাড়। ভোরবেলা না বলে চলে গেছ, কিছু খেয়ে যাওনি, অনেক শাস্তি পাওনা আছে তোমার!'

'এখন শাস্তি দাও!'

'সারাদিন চুমু বন্ধ।'

আঁতকে উঠল আরিফ। 'না, না, মরে যাব! অন্য কোন শাস্তি দাও।'

আইরিন তার পাশে বসে কাঁধে মাথা রাখল। 'নাশ্‌তা খেয়ে নাও।'

গোগ্রাসে পরোটা আর ডিম খেল আরিফ। ঢকঢক করে পানি খেল দু'গ্লাস। তারপর আইরিনের মুখোমুখি হল।

'এবার আমাকে সব বল, আরিফ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না এত অন্ধকার!'

'বেশ। শুরু করা যাক।'

একটু ভাবল আরিফ। তারপর বলল, 'আমার পুরো নাম আরিফ ইফতিখার তোকো।'

আট

একটু থেমে আইরিনের মুখের দিকে তাকাল আরিফ। হয়ত আশা করেছিল, পুরো নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারবে সে।

'আয়্যাম সরি,' বলল আইরিন। 'কোথাও শুনেছি নামটা, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।'

শ্রাগ করল আরিফ। 'সবাই-ই নিজেকে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করে। কিছু মনে কর না। আমার বাড়ি মৌরিদ্বীপ। বিদেশী শাসকেরা নাম দিয়েছিল মরিল্যাণ্ড।'

আইরিনের কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। ডাগর চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল আরও। বলল, 'মৌরিদ্বীপ? চিনেছি। বাংলাদেশের সোজা দক্ষিণে, সমুদ্রসীমা থেকে, এই ধর, দু'শো মাইল দূরে, তাই না? দাঁড়াও, আর একটু মনে করি। বেশ কিছুদিন আগে কি যেন একটা ঘটেছে ওখানে। নিউজপেপারের হেডলাইনে এসেছিল।'

'দ্যাটস্ রাইট। বিপ্লব হয়েছিল আমাদের দেশে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের হতভাগ্য ছোট্ট একটি দেশ, কে তার খবর রাখে?

আড়াই হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তন। লোকসংখ্যা তিন লাখের সামান্য বেশি। বড় বড় ঘটনাসংকুল পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের সে বিপ্লবের খবর খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন।'

আরিফ থামল। আইরিন সরে এসে তার কাঁধে হাত দিল। 'বল, আরিফ। গোড়া থেকে সব খুলে বল আমাকে।'

'বেশ,' আবার শুরু করল সে। 'মৌরিদ্বীপ আমার দেশ। আমার প্রিয় স্বদেশ। আমি সে দেশের প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতাচ্যুত। বিতাড়িত। বিড়ম্বিত।'

আইরিনের চোখ থেকে যেন মণি ঠিকরে বেরিয়ে যাবে, এমন দেখাল তাকে।

'মানে···আ···তুমি···তুমি সেই এ· আই· তোকো? পৃথিবীর সর্ব কনিষ্ঠ স্বাধীন দেশ মরিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট?'

নিজের চুল দু'হাতে খামচে ধরল আইরিন। 'আমি এমন বেকুব? ছি ছি ছি! নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করতাম। কিন্তু এদিক দিয়ে একটু ভাবনাও আসেনি আমার!'

'টেক ইট ইজি, ডার্লিং! আমার অনেক কথা আছে তোমায় বলার। অথচ সময় বেশি নেই।'

'বল, আমি সব শুনব। তারপর?'

'বিদেশী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আমার দেশের মানুষ প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ১৯৭১ সালে। গোটা বিশ্ব তখন বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, আমাদের দিকে তাকানোর অবসর পায়নি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

আরও কয়েকজন বিদেশী ছাত্রের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞও প্রত্যক্ষ করছি।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আইরিন সদ্য বাবা-মা-হারান চোদ্দ বছরের কিশোরী। সেই ভয়াবহ দুঃসময়ের কথা মনে হতে শিউরে উঠল সে।

'সরি, হয়ত তোমার কিছু অপ্রিয় কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।' বলল আরিফ।

আইরিন বলল, 'শুধু অপ্রিয় নয়, অনেক প্রিয় কথা, প্রিয় দৃশ্যও আমার স্মৃতিতে লেখা আছে। ঐ বছরটা আমাদের জাতির জীবনে সবচেয়ে দুঃখের বছর। সবচেয়ে আনন্দেরও বছর। তারপর? তোমার কথা বল।'

'তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। আমি স্থির করলাম, ব্যর্থ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষের মধ্যে। দেশকে মুক্ত করতে হবে, পরাধীনতা আর নিপীড়নের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তিন লাখ মানুষকে।

'ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অমানুষিক, কঠোর পরিশ্রম করেছি মৌরিদ্বীপ লিবারেশন আর্মি গঠন করতে। মুষ্টিমেয় কিছু রক্ষণশীল ডানপন্থী বিপক্ষে রয়ে গেল। সব কালে, সব দেশেই থাকে এরকম কিছু লোক। কিন্তু তাদেরকে মর্মান্তিকভাবে পরাস্ত করে এ বছর জানুয়ারির উনিশ তারিখে বিজয় অর্জন করি আমরা।'

'জানি। তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল আইরিন।

'কিন্তু উগ্র ডানপন্থী দলটি বিদেশী মতলববাজদের টাকা খেয়ে

গোপনে সংগঠিত করছে নিজেদের, এটা বুঝে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আমার সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধোত্তর সংস্কারে, পুনর্গঠনে। আমরা ব্যস্ত ছিলাম ব্রিজ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, গণশিক্ষা প্রসার, বিনোদন, জনসংখ্যা রোধ আর স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে।

'গত মঙ্গলবার রাত দেড়টা পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম নানা ঝামেলায়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ভবন থেকে বাসায় ফিরে আড়াইটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর পাঁচটায় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার।'

'তারপর?'

'খবর পেলাম, উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সেনাবাহিনীর একটা অংশ। অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তারা। ক্যান্টনমেন্টের সবচেয়ে বড় ম্যাগাজিন, রেডিও-টিভি স্টেশন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ভবন, সবকিছু দখল করে নিয়েছে।'

'তুমি পালালে কিভাবে?'

'অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে আমাকে। তারা কৌশলে বের করে আনে আমাকে। হেলিকপ্টারে উঠিয়ে তারা আমাকে সুন্দরবন উপকূলে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেখান থেকে ঢাকা চলে আসি আমি। ওখানে একদিন থাকার পর বুঝতে পারি, বিদ্রোহীদের লোকজন আমার অবস্থান টের পেয়ে গেছে। চলে আসি চট্টগ্রাম। সেখানেও আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে ওরা। সবদিক ভেবে দেখলাম, এমন একটা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে, যেখান থেকে দেশের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখতে পারব আমি।

'কক্সবাজার এলাকা বেছে নিই আমি। যোগাযোগও হয় আমার লোকজনের সঙ্গে। খবর পেলাম, বিদ্রোহীরা সরকার গঠনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এরই মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছে নিজেদের মধ্যে। ওদিকে আমাদের শান্তিকামী, গণতন্ত্রকামী মানুষ খেপে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। কাজকর্ম বন্ধ। প্রশাসন কার্যত অচল করে দিয়েছে তারা।

'মৌরিদ্বীপ লিবারেশন আর্মি আবার সংগঠিত হয়েছে। জনসাধারণের সাহায্যে ওরা আঘাত হানতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় বিদেশের মাটিতে আত্মগোপন করে থাকা আমার জন্যে কতখানি কষ্টের, অনুভব করতে পার?'

আইরিন দুই হাতে আরিফের নিচু হয়ে যাওয়া মাথা উঁচু করে ধরল।

'এখন···এখন তুমি কি করবে ভাবছ?'

'তোমার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলাম আমি। মনে হয়, ওরা এই চা বাগানের হদিস পাবে না। আরও একটা দিন অপেক্ষা করব। তারপর ঢাকা চলে যাব। সেখান থেকে আমার দেশে যোগাযোগ করব আমি। যে কোন উপায়ে দেশে ফিরতে হবে আমাকে। লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে।'

আরিফের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলল আইরিন। 'আমাকে একা ফেলে যাবে তুমি? কক্ষনো না। কিছুতেই থাকব না আমি এখানে। আমি···আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'আমিও তো তাই চাই, সোনামণি। কিন্তু এত কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি দেশের রাজা হতে পারি, কিন্তু জীবন আমার এতটুকুও রাজকীয় নয়। বিলাসের কোন চিহ্নই নেই সেখানে। চরম দুর্যোগ বয়ে যাচ্ছে আমার দেশের ওপর দিয়ে। পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। ইতিমধ্যেই তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছি, তার জন্য আমার অনুতাপের সীমা নেই। আর কত নিষ্ঠুর হতে বল আমাকে?'

আইরিনের চোখের পানি মুছিয়ে দিল আরিফ। 'কেঁদ না। আমার দুর্বিষহ জীবনে দেবীর মত দেখা দিয়েছ তুমি। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হলে হয়ত এত সতর্ক হবার প্রয়োজন মনে করতাম না এবং একসময় সুযোগ বুঝে ওরা মেরে ফেলত আমাকে। তুমি আমার গার্জেন এঞ্জেল, সোনা।'

'কিন্তু তুমি একলা যেতে পারবে না। কিছুতেই না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'এখন নয়,' কঠিন স্বরে বলল আরিফ। 'এখন আমাদের পদে পদে বিপদ। রাস্তায় বের হওয়াটাই মস্ত ঝুঁকির কাজ। দেখছ না কিভাবে ওরা তাড়া করে ফিরছে আমাকে? সংখ্যায় ওরা অনেক। বাংলাদেশের শহরে শহরে ছড়িয়ে আছে ওদের লোক। এখানকার উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও সাহায্য করছে ওদের। তুমি কয়েকদিনের জন্যে এখানেই থাক। আমি ঢাকা যাব। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমার লোক আছে। তার কাছে খবরাখবর নিয়ে মালদ্বীপ হয়ে দেশে রওনা হবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু একটা কথা,' ইতস্তত করে বলল আইরিন। 'বাংলাদেশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে না কেন তুমি?'

আইরিনের গাল টিপে টুপ্ করে একটা চুমু খেল আরিফ। বলল, 'বাহ্, ইয়েলো ডিয়ারের স্টেনো কূটনৈতিক খোঁজখবরও রাখে দেখছি!'

'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'কূটনৈতিক আশ্রয় হয়ত আমি পেতাম। কিন্তু তোমার সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে আমার দেশের সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করতে পারতাম না। আমার কাছে আমার সংগ্রাম যতই ন্যায্য হোক, তোমাদের সরকারের কাছে মৌরিদ্বীপের ঘটনাবলী একান্তই 'অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার'। তোমাদের দেশ তাতে জড়াতে চাইবে কেন? তার চেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্যে আবেদন জানালেই আমার অবস্থানের কথা গোটা দুনিয়া জেনে যাবে। আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অপপ্রচারে সুবিধা হবে আমার শত্রুপক্ষের।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল আইরিন। বুঝতে পারছে সে, ব্যাপারটা তার নাগালের বাইরে। ওর কানের লতিতে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল আরিফ। 'চলি, মেমসায়েব। তিন নম্বর বাগানে বার্ষিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে আসি। দুপুরে রাণী এলিজাবেথের সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় যোগ দিতে আসব দুপুর দু'টোয়। তারপর পার্লামেন্টে পরিকল্পনা বিষয়ে ভাষণ, কেমন?'

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না আইরিন। বাইরে থেকে

দরজা টেনে দিয়ে আরিফ বেরিয়ে গেল। জানালাপথে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে। উথালপাতাল চলছে তার মনের ভেতর। সাধারণ এক স্টেনো মেয়েকে ভালবেসেছে মৌরিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট এ. আই. তোকো? বুকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে?

প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল ওর। লোকটি, যে-ই হোক, সাধারণ কেউ নয়। তার সমস্ত কথা, সমস্ত আচরণই অসাধারণ। বিশাল হৃদয় তার, অনন্ত জ্ঞানের পরিধি। আইরিন কি এখন তাকে নিজের পরিচয় দিতে পারে? আরিফ কিভাবে নেবে সেটাকে?

ভয় হলো আইরিনের। এখন থাক, আরও পরে আত্মপরিচয় দেয়া যাবে, ভাবল আইরিন। পরিচয় বলতে তো কেবল তার নাম আর পেশা। ভালবাসার জন্যে ওগুলো জরুরী কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভালবাসা? ভালবাসার নিশ্চয়তা কোথায়? কয়েক মুহূর্ত আগেও তার মনে হচ্ছিল, আরিফের সমস্ত ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু সে। মনে হচ্ছিল, যে ভালবাসা সে আকৈশোর খুঁজে ফিরছে, পেয়েছে সে ভালবাসা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে একাই অত বেশি ভালবেসে ফেলেছে। আরিফ একটি দেশের প্রেসিডেন্ট। দেশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে তার মন। তার ভালবাসা ছড়িয়ে আছে দেশের মানুষের প্রতি আর তাদের নেতা হিসেবে কর্তব্যের প্রতি। দলের প্রতি। আইরিনকে সে বোধহয় অতটা ভালবাসে না, যতখানি আশা করে আইরিন। এই মুহূর্তের বিতাড়িত, পলাতক দিনগুলোতে তার যথেষ্ট অবসর।

তাই সে ভালবাসছে আইরিনকে। তারপর মৌরিদ্বীপে পৌঁছে নিজের প্রকৃত ভালবাসার জগতে হারিয়ে যাবে সে। সেখানে সংগ্রাম, রাজনীতি, দর্শন, প্রশাসন, সবকিছু থাকবে, শুধু থাকবে না আইরিন।

আইরিন তাহলে কি করবে? সব খেলা শেষ করে দেবে? ভাবতেই হাহাকার করে উঠল ওর হৃদয়। মরেছে সে। আরিফকে উজাড় করে দিয়েছে সে ওর হৃদয়ের পুরোটাই। আরিফহীন পৃথিবীর কথা ভাবতেই পারছে না। ঢাকার বাসার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যার কথা মনে হতে গা শিরশির করে উঠল তার। ওখানে একলা শুতে পারবে না সে। কি হবে অত টাকা-পয়সা, শিল্প বাণিজ্য দিয়ে?

মুহূর্তের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে পড়ল সে। এখানেই থাকবে সে কয়েক দিন, আরিফের যেমন ইচ্ছা। তিলে তিলে নিজেকে তৈরি করবে সে অন্য একটি সমাজের জন্যে। অন্য একটি ভাষা শিখতে হবে তাকে। পরিচিত হবে অন্য ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে। এই কয়েকদিনে আরিফের স্বপ্নগুলোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার। মনে মনে ভেবেছে, ওগুলো কেবলই স্বপ্ন। কিন্তু এখন সে জেনেছে, আরিফ স্বপ্নবিলাসী নয়। যুক্তিসঙ্গত স্বপ্ন তার। সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নের জন্যে জীবন বাজি রেখেছে আরিফ। আইরিন তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবে তাকে। নতুন সমাজ গড়ে তুলবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের সুদূর দ্বীপে। সেই সমাজের গণতান্ত্রিকতা, মানবিক বোধ, উন্নত সাংস্কৃতিক মান, অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা, সামাজিক গতিশীলতা যদি

সার্কের অন্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রভাবিত হয়, হয়ত গোটা মহাদেশেই নতুন জীবনের সঞ্চার হবে।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠল আইরিনের মন। দরজা বন্ধ করে ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরুল সে। আরও কিছু কেনাকাটা করা দরকার। এবার নিজের হাতে বয়ে আনবে তার জিনিসপত্র। অলক সাহার ভরসায় ফেলে আসবে না। ডেঞ্জারাস ছেলেটা! নিনিকে ডাকল সে। নিনি সানন্দে ছুটে বেরিয়ে এল। চলল ওর পাশে পাশে।

কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মস্ত তালা ঝুলতে দেখে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ল ওর।

নিনি বলল, 'চিন্তা করবেন না, খালা, বড় সায়েবের অফিসে গেলেই সাহা ম্যাডামকে পাওয়া যাবে। খরিদ্দার বেশি নেই তো, ম্যাডাম এই সময়ে দোকান বন্ধ করে সায়েবের অফিসে চলে যায়। কারও জরুরী দরকার থাকলে ওখান থেকে ডেকে আনে।'

একটু ভাবল আইরিন। তারপর বলল, 'তোমাদের ম্যানেজার রাগ করবে না তো?'

'না, না,' ব্যস্ত হয়ে বলল নিনি। 'জিনিস বিক্রি হলে তো ওদেরই লাভ। রাগ করবে কেন?'

সরু ইটের রাস্তা পার হয়ে একটা বাগানে পড়ল ওরা। বাগানের শেষ প্রান্তে বড় রাস্তার শুরু। বড় রাস্তা ধরে একটা ছোট টিলা পার হয়ে পৌঁছল অফিস ভবনে। ওয়াকিং আওয়ার। লোকে গিজগিজ করছে প্রাঙ্গণ, বারান্দা আর অতিরিক্ত রুম-

গুলো।

নিনি আইরিনের হাত ধরে বারান্দার ভিড় ঠেলে ওয়েটিংরুমে পৌঁছল। এই রুমে কাল সে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আরিফকে। হাসি পেল তার।

খালেক চেয়ার ছেড়ে উঠে বসতে দিল আইরিনকে ভেতরের ঘরে যাবার দরজার পাশে। নিনি বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি মিসেস সাহার কাছে এসেছিলাম। ওঁর দোকানটা বন্ধ দেখলাম···' বলল আইরিন।

খালেক বলল, 'বড় সায়েবের ঘরে যখন বাইরের লোক থাকে, তখন যাওয়া মানা। একটু বসেন।'

আইরিন নিজেই বুঝতে পারল, রাজকুমার সাহা ব্যস্ত আছেন। কারও সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে তাঁর। দু'একটা কথা কানে যেতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে আইরিনের।

রাজকুমার সাহা বলছেন, 'আমার স্টাফ কে কবে জয়েন করল, কবে চলে গেল, সে খবরে আপনার কি দরকার?'

আরও উৎকর্ণ হল আইরিন।

'না, মানে,' বিনীত হবার চেষ্টায় অন্য কণ্ঠটি বলল, 'আমাদের শুধু জানা দরকার ছিল, গত দুই-এক দিনের মধ্যে আপনার এখানে কেউ আশ্রয় নিয়েছে কিনা।'

রাজকুমার সাহা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'সেটাও আমাদের নিজেদের ব্যাপার।'

'নিজেদের ব্যাপারে আপনারা কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা

করেন, মনে হচ্ছে।' ব্যঙ্গের সুর আগন্তুকের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, আপনাদের মতই।'

'আমাদের মতই মানে?'

'এই যেমন, আপনারা নিজেদের পরিচয়ের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা পালন করছেন! দু'বার জিজ্ঞেস করেছি আমি। আপনারা চেপে যেতে চান।'

'দেখুন, ম্যানেজার সাহেব, আপনাকে কেবল এইটুকু বলতে পারি, পলাতক ব্যক্তি সম্পর্কে যে কোন জায়গায় যে কোন ধরনের খোঁজখবর নেয়ার অধিকার আছে আমাদের।'

'পলাতক ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার জন্যে ফার্ম খুলেছি নাকি আমরা, অ্যাঁ?'

'কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি আপনাদের এখানে এসে উঠেছে এবং চাকরি নিয়েছে।'

বিরসমুখে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা গোয়েন্দা পুলিশের লোক?'

'ঠিক তা না হলেও···'

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সাহাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ব্যাস্, তাহলে এখন দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আমি আপনাদের মত দুই-একজন পলাতকের পেছনে ঘুরি না, প্রায় দেড় হাজার পলাতক নিয়ে আমার কারবার। একটু চান্স পেলেই সব শালা কাজে ফাঁকি দিয়ে পালায়। অযথা ঝামেলা করবেন না।'

'মিস্টার সাহা, আপনার কাছে সহযোগিতা পাব, আশা করেছিলাম।'

'আপনাদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে; আমাদের ফার্মের সব নিয়োগ-বদলি-শাস্তি-পদোন্নতির কাগজপত্র ঠিক আছে। আলতু-ফালতু লোক আমাদের এখানে নেই। এবার বিদায় হোন, মশায়।'

'যদি না হই?'

'খামকা ভয় দেখাবেন না। মেইন গেটে গুলি ভরা বন্দুক হাতে পাঁচজন ট্রেইণ্ড সিকিউরিটি গার্ড পাহারা দিচ্ছে। যদি পারেন, ওদেরকে ভয় দেখান গিয়ে।'

'সাহাবাবু,' চাপা স্বরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করল তৃতীয় কণ্ঠ, 'আপনার কপালে খারাবী আছে। যদি আপনার ফার্মে তাকে পাওয়া যায়, ফার্মের তেরটা বাজিয়ে ছেড়ে দেব।'

'গেট আউট!' রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন রাজকুমার সাহা। 'অনেকক্ষণ থেকে সহ্য করছি আপনাদের। এটা কাজের জায়গা। মাস্তানি করার জায়গা নয়। বেরিয়ে যান! খালে—ক! গার্ডদের ডাক।'

লোকগুলো দ্রুত বেরিয়ে গেল। পিওনের চেয়ারে ঘোমটা টেনে বসে আইরিন দেখল, তারা দু'জন। হোটেল হাওয়াই-এর করিডরে যাদের দেখেছিল, এরা তারা নয়, অন্য দু'জন। দেখতে অনেকটা ওদেরই মত। তবে কথাবার্তা বলে বিশুদ্ধ বাংলায়।

আইরিন অনুভব করল, তার পা অসাড় হয়ে গেছে। কোনরকমে উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে নিনির হাত ধরল।

'কি হল, খালা ? ম্যাডামকে ডাকবেন না ?'

'না, শরীরটা ভাল লাগছে না। চল, বাসায় যাই।'

'চলুন, খালা। সত্যিই আপনাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে।'

তাহলে 'ওরা' চা-বাগান পর্যন্ত এসে পড়েছে। এই জায়গা এখন আর এক মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নয়। লোকগুলো কোন্-দিকে গেল, কে জানে ?

টিলার কাছে পৌঁছে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আইরিন। নিনি অনর্গল কথা বলছে। কি কি যেন জিজ্ঞেসও করছে, আইরিন শুনতে পাচ্ছে না সেসব। ব্যাগ থেকে একশো টাকার নোট বের করে নিনির হাতে গুঁজে দিল সে।

'এটা কেন, খালা ? এত টাকা দিয়ে কি করব আমি ?'

সস্নেহে নিনির মাথায় হাত বুলাল সে। 'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, নিনি। খুব ভাল। এটা দিয়ে ভাল বিস্কুট কিনো আর ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে খেও।'

'আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ? এমন করছেন কেন ?'

'না, পাগলি। আমার একটা কাজ যদি করে দাও…'

'কি কাজ, বলেন ?'

'তোমার খালুকে খুঁজে বের কর। খুব জরুরী দরকার। কিন্তু সাবধান। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। তাকে যদি পাও, কানে কানে বলবে, এক্ষুণি বাসায় ডেকেছি আমি। এক্ষুণি।'

হাসিখুশি মেয়েটির মুখে দুঃশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়ল।

'আপনার খুব বিপদ, না ?'

'হ্যাঁ। তুমি বাগানের দিকে যাও। আমি বাসায় যাই।'

টিলার গোড়া থেকে বাঁ-দিকের সরু পথ ধরে নিনি চলে গেল। আইরিন দ্রুত পায়ে হেঁটে টিলা পার হল। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেইন গেট, অ্যাপ্রোচ রোড, সব দেখা যায় টিলা থেকে। কেউ কোথাও নেই। কোন গাড়ির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। লোকগুলো কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

কোয়ার্টারের কাছাকাছি এসে দরজা খোলা দেখতে পেয়ে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ল সে। ঐ তো, আরিফ ফিরেছে! অযথা মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে তাকে খুঁজতে পাঠাল। কোন দরকার ছিল না। একটু ধৈর্য ধরলেই হত।

প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল সে। ঘরে সিগারেটের গন্ধ। টেনশন কাটাতেই কি আরিফ সিগারেট ধরিয়েছে? প্রায় অন্ধকার ঘর। ঝলমলে আলো থেকে এসে চোখে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'কে?' আইরিনের গলা চিরে ফ্যাঁসফেঁসে স্বর বেরুল।

পায়ের নিচে সিগারেটের টুকরো পিষে নিবিয়ে ফেলে অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠে কেউ একজন বলল, 'কর্তা কোথায়, ম্যাডাম?'

মেজাজ খারাপ করার মত ব্যাপার। অসহিষ্ণু কণ্ঠে আইরিন বলল, 'কে আপনি? ঘরে ঢুকলেন কিভাবে?'

'তালা ভেঙে। উপায় ছিল না। এতদূর থেকে এলাম চা-বাগানের সুপারভাইজারের অতিথি হতে। এক কাপ চা না খেয়ে যাই কি করে, বলুন?' পরিহাস-তরল অথচ দৃঢ় উচ্চারণে বলল আগন্তুক।

'তার মানে? খয়ের উদ্দিন মিয়ার কেউ হন নাকি আপনি?

খয়ের উদ্দিন মিয়া তো…'

'শাট্ আপ, মিস তামান্না,' চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল লোকটা। 'ন্যাকামি করবেন না। আরিফ সাহেব কোথায়, ঝট্‌পট্ বলুন! সময় নেই।'

মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল আইরিনের। ধরা পড়েছে সে। কিন্তু আরিফকে বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করা যায়? নিনি যে কোন মুহূর্তে আরিফকে ডেকে আনবে। উফ্! কিছুই মাথায় আসছে না। এই পন্নমতিত্ব নিয়ে একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানের ছায়াসঙ্গিনী হবার দুরাশা পোষণ করে সে? ধিক্! নিজের ওপর অক্ষম আক্রোশে কেঁদে ফেলল আইরিন।

নয়

বাইরে মোটর সাইকেল থামল একটা। আইরিনের ফোঁপানি সশব্দ কান্নায় রূপান্তরিত হল। নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে আরিফ। চিৎকার করে উঠবে নাকি আইরিন? বলবে কি, 'পালাও, আরিফ, পালাও, আমি ওদের হাতে ধরা পড়ে গেছি! কিন্তু মোটর সাইকেলের আরোহী আরিফ না-ও তো হতে পারে! সেক্ষেত্রে উল্টো বিপদের সম্ভাবনা।

অনুমান সত্যি হল। দরজা দিয়ে ঢুকল অলক। আগন্তুক পিস্তল তাক করতে দেরি করে ফেলেছে। ঘরের আলো-আঁধারিতে অলকের হাতে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল কাটা রাইফেল।

'হা হা হা,' বিজয়ীর হাসি হাসছে অলক। ওয়াটার রিজার-ভয়ারের ওপরে বসে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। অবলা নারী পেয়েছ, আর অমনি হানা দিয়েছ, তাই না? অস্ত্র ফেলে দাও হাত থেকে!

লোকটি ভয়ে ভয়ে পিস্তল নামিয়ে রাখল। তার পিঠে রাইফেলের নলের গুঁতো দিয়ে ঘরের কোণে নিয়ে গেল অলক।

পিস্তল কুড়িয়ে পকেটে রাখল।

'আমি···আমি···অন্য একটা ব্যাপারে···'

'কি ব্যাপারে মাস্তানি করতে এসেছ এখানে?' খেঁকিয়ে উঠল অলক। 'জান না, এখানকার বড় মাস্তান অনুমতি না দিলে কেউ এখানে মাতব্বরি করার কথা ভাবতেও সাহস পায় না!'

'ইয়ে, দেখুন, আমি এসেছি···এই বাসায় যে লোকটি থাকে, তার কাছে। আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ গোপন ব্যাপার আছে। অন্য কাউকে আমরা বিরক্ত করতে চাই না।'

'খয়ের উদ্দিন মিয়া আমাদের ফার্মের খুব দরকারী লোক। আমার বাবার খুবই বিশ্বাস তার ওপর। তোমার লোকজনকে সে-কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। নাউ, গেট আউট!'

'আমার একটা কথা শুনুন।'

'কোন কথা নয়,' রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরে বলল অলক, 'এই মহিলার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। দূর হও! তোমাকে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব আমি। আর যদি চালাকির চেষ্টা কর, মুণ্ডুটা আলাদা করে রেখে দেব। এরকম অভ্যাস আমার আছে।'

ওরা বেরিয়ে গেলে চোখ বুজে বিড়বিড় করল আইরিন, 'আল্লা, মেহেরবান, অলক এসে না পড়লে কি যে বিপদ হত! তুমিই পাঠিয়েছিলে অলককে।'

অলকের ওপর যে বিদ্বেষ জন্মেছিল আইরিনের, নিমেষের মধ্যে সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু ধাঁধা কাটল না। এই লোকটি একা নয়, সঙ্গে আরও

লোক ছিল। তারা কোথায়? এ লোকটি একা এসেছিল কেন? তামান্না আর আরিফ নামের ব্যাপারে সে এত নিশ্চিত হল কি করে? দেখে ও কথা শুনে তাকে বাঙালিই মনে হয়, কিন্তু আরিফকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন? অলকের মনেই বা সন্দেহের উদ্রেক হল না কেন? শুধু অলক নয়, তার বাবা কিংবা মা, কারও মনে সন্দেহ জেগেছে বলে মনে হল না তার। নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাকাডাকি শুরু হয়ে যেত। আরিফ বা আইরিনের ব্যাপারে রাজকুমার সাহা এত নিশ্চিত কেন? কেন? কেন? কেন? অসংখ্য 'কেন' তার মাথায় কিলবিল করে উঠছে পোকার মত।

এখন কি করবে সে? এখানে এখন প্রতিটি মুহূর্ত বিপজ্জনক। কি ঘটতে পারে, সে ভাবতেই পারছে না। পালাবে? কিন্তু আরিফ কিভাবে ওকে খুঁজে পাবে তাহলে?

আইরিনের প্রতিটি সেকেণ্ড শ্বাসরুদ্ধকর উদ্বেগের ভেতরে কাটতে লাগল। অধীর আগ্রহে জানালায় মাথা রেখে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে। গোডাউনের পাশ দিয়ে ঐ যে ছোট রাস্তা চলে গেছে, তার বাঁকে হঠাৎ দেখা দিল তার প্রিয় মুখ। তার ভালবাসা। প্রাণে আনন্দধ্বনি জেগে উঠল আইরিনের।

আরিফ ঘরে ঢুকতেই তার বুকে আছড়ে পড়ল আইরিন। কান্না এসে কথা আটকে দিচ্ছে তার। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কষ্টে শান্ত করল আরিফ।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে আইরিন বলল, 'এক্ষুণি পালাতে হবে, আরিফ। আমরা ধরা পড়ে গেছি। 'ওরা' সব টের পেয়ে গেছে। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। তোমাকে পেলেই খুন করবে

ওরা।'

আরিফকে নির্বিকার দেখাল। আইরিন তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ডু ইউ হিয়ার মি? অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমি। আমাকে ধরে ফেলেছিল ওরা।...'

শান্ত কণ্ঠে আরিফ বলল, 'তুমি এখন দারোয়ানের কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নেবে। আমি কয়েকটা দরকারী কাজ সেরে সন্ধ্যার পরপর তোমার সঙ্গে মিলিত হব। তারপর পালাতে হবে।'

'কিন্তু এখন নয় কেন? ওরা আশেপাশেই আছে। এই জায়গাটাকে নিরাপদ মনে কর তুমি?'

'ঠিক এই কারণেই এখন পালান যাবে না। দুইদিকের রাস্তাতেই তাদের সশস্ত্র লোকজন রয়েছে। কুকুরের মত গুলি করে মারবে আমাদের।'

শিউরে উঠল আইরিন। রাস্তার ওপর বেঘোরে মৃত্যুবরণের কল্পিত দৃশ্যের ভয়াবহতা থেকে বাঁচবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'নিনি কোথায়?'

'নিনি বাসায় গেছে তোমার আস্তানার ব্যবস্থা করতে। তারপর এসে তোমাকে নিয়ে যাবে সে। ওদের বাড়ির পেছন দিকে একটা গোপন পথ আছে। ওটা ব্যবহার করতে পার তুমি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'চা-বাগানের এরিয়ার বাইরে একটা মোটর ওয়ার্কশপ আছে। ওখান থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কিনা, খোঁজ নিতে হবে!'

'তুমি কখন টের পেয়েছ, 'ওরা' এসে গেছে?'

'একটু আগে। রাজকুমার বাবু ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে গোপনে খবর দিয়েছেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন, এসবের কিছু উনি বোঝেনই না।'

'কিন্তু ঐ লোকগুলো শাসিয়ে গেছে রাজকুমার বাবুকে।'

'আমরা পালিয়ে গেলে সব ম্যানেজ করে ফেলবেন উনি। ভেবেছিলাম, কয়েকদিনের জন্যে তোমাকে লুকিয়ে রেখে যাব এখানে। কিন্তু হল না। তোমার ভাগ্যটাই খারাপ। আমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই ভোগান্তি শুরু হয়েছে তোমার। কবে যে আমি এই অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচব!'

আরিফের গলা জড়িয়ে ধরে আইরিন বলল, 'আমায় তুমি পুতুলের মত সাজিয়ে রাখতে চাও কেন, আরিফ? ছায়াসঙ্গিনী ভাবতে পার না? ছায়া কখনও কায়া থেকে দূরে থাকতে পারে?'

আরিফ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমি জানতাম না, ভালবাসা এত ভয়ংকর হতে পারে। আমি তোমাকে এতখানি ভালবেসে ফেলেছি যে, তোমার সমস্ত শরীর আর সমস্ত হৃদয় আমি আমার অন্তরে অনুভব করতে পারি। তোমার কষ্টগুলো তোমার চেয়ে আমাকে বেশি কষ্ট দেয়।'

আইরিনের শরীর কেঁপে উঠল। এখন এই মুহূর্তে ওর কোন ভয় নেই। ও ভুলে গেছে, মাত্র কিছুক্ষণ আগেও চরম বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল সে। এখনও চারদিকে বিপদ ওত পেতে আছে। থরথর ঠোঁট আর বিস্ফারিত চোখ নিয়ে আইরিন আরিফের মুখের কাছে এগিয়ে গেল।

হৃদয়ের গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত আবেগের সাথে চুম্বন

দিয়ে আরিফ বলল, 'আমি জানতাম, তামান্না, এরকম যোগ্য জীবনসঙ্গিনী পাব আমি। আমি যে যুগ যুগ তার জন্যে অপেক্ষা করেছি। আমার চারপাশে সবসময় অসংখ্য নারী পাখির ঝাঁকের মত ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু আমার হৃদয় কেবল খুঁজে ফিরেছে ঠিক তোমার মত কাউকে। এমন একজন সঙ্গিনীর সত্যিই আমার বড় দরকার ছিল, যে আমার স্বপ্নগুলোকে অনুভব করতে পারবে, আমার চোখে সে-ও দেখবে অভিন্ন সেই স্বপ্ন, আর তা বাস্তবায়নে আমার হাতে হাত রেখে চলতে পারবে দুর্গমতম পথে। ভয় পাবে না, দুঃখ করবে না। সাহস যোগাবে, আনন্দিত রাখবে আমাকে। তার কাছে হৃদয়ের সমস্ত চাওয়া পূর্ণ করে আমি তা ফিরিয়ে দেব আমার স্বদেশের প্রতিটি ঘাসে, বালুকণায়, জলবিন্দুতে।'

আবার মুখ চুম্বনের জন্য নিচু হয়েছিল আরিফ। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল আইরিন। 'ছাড়, নিনি আসছে!'

দারোয়ান ডিউটিতে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে তার স্ত্রীও পাড়া বেড়াতে বেড়িয়েছে। আইরিন ঘুমিয়ে পড়েছিল আরিফের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে। আধোঘুমে, আধো জাগরণে সে দেখল, আরিফ ফিরে এসেছে। শয্যার পাশে বসে সে তার হাত রাখল আইরিনের হাতে। আইরিন বুকের ওপর তুলে নিল সেই হাত।

কিন্তু হঠাৎ রক্তমাংসের সেই হাত সাঁড়াশিতে রূপান্তরিত হয়েছে বুঝতে পেরে ঘুম ছুটে গেল তার।

'সুইট ডার্লিং!' অলকের কণ্ঠস্বরে আইরিনের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দা খসে গেল। অদম্য কামনাকে জ্বলতে দেখল সে সামনে।

'আশ্চর্য দুঃসাহস তোমার! ও এক্ষুণি ফিরে এসে গায়ের চামড়া তুলে নুন ছড়িয়ে দেবে তোমার গায়ে। ওকে তো চেন না!'

'ওকে চেনবার কোন দরকার নেই আমার,' আইরিনের কোমড় জড়িয়ে ধরে ওর মুখের কাছে মুখ এনে অলক বলল, 'আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি রহিমের রূপবান। ইউসুফের জোলায়খা। তুমি আমার হৃদয়ে, দেহে ভালবাসার আগুন জ্বেলে দিয়েছ।'

প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল আইরিন, কিন্তু অসুরের শক্তি ছোকরার হাতে। ব্লাউজের বোতামে সে হাত তৎপর হয়ে উঠেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আইরিনের। কখন আসবে আরিফ। তার বাস্তব জীবনের রাজপুত্র? কখন শুনবে তার ঘোড়ার খুরের শব্দ? কত দেরি?

আইরিন তার চোখে, কপালে ও গালে অলকের তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল। অমোঘ নিয়তির মত অবাঞ্ছিত শরীর নেমে আসছে তার শরীরের ওপর। সশব্দে থুথু ছুঁড়ল সে অলকের মুখ লক্ষ্য করে। তাতে অলকের কিছু যায় আসে না।

বলল, 'ডার্লিং, যা আপোষে দিতে পার, তা দিতে এত কী স্বীকার করছ কেন?'

'চিৎকার করে লোক ডাকব আমি!' হাপরের মত বুক ওঠা-

নামা করছে আইরিনের। অলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে-দিকে। তার বন্ধন শিথিল করে উঠে বসল আইরিন।

'বেরিয়ে যাও, প্লিজ—'

গাল থেকে আইরিনের থুথু মুছে অলক সোজা হয়ে বসল। 'তার মানে, তুমি চাও, আমি বিদেশী লোকটাকে তার অনুসন্ধানকারীদের হাতে তুলে দিই? আর কাঁচা গিলে খাবার জন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি তাদের খোঁয়াড়ে?'

একটা পালস্ বিট মিস করল আইরিন। ওর মনে হল, শরীরটা হঠাৎ শীতল হয়ে গেছে তার।

'এ সবের মানে কি, অলক?'

'খুব সোজা। আমার কাছে যতটা, তার চেয়ে সোজা তোমার কাছে। লোকগুলো আমাদের এলাকায় ঢোকার পর থেকেই আমি আড়াল থেকে নজর রাখছিলাম। বাবার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা থেকেই অনুমান করেছি, গোলমালটা কোথায়। বাবা সহজ-সরল মানুষ। কিন্তু তিনিও গোলমাল টের পেয়েছেন। কিন্তু ঐ এক নীতি তাঁর। বাগানের কোন কর্মীর গায়ে তিনি এতটুকু আঁচড় লাগতে দেবেন না।'

'আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাদের গায়ে নোংরা আঁচড়, কামড় দিয়ে উসুল করে নিতে চাও?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল আইরিন।

'সে তো কেবল তোমার জন্যে, সুন্দরী! তুমি আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। এমনিতেই সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। আর তুমি তো স্বর্গের অপ্সরা। তোমার

মুখের প্রতিটি শব্দে আমার রক্ত নেচে ওঠে। তোমার সামান্য নড়াচড়া আমার কলজে নাচিয়ে দেয়। তুমি যদি জানতে, তুমি কি!'

'অলক, আমি কি, তা একজনই জানবে। ফ্লার্টারি কর না। পরের বউয়ের দিকে চোখ দেয়া খুব খারাপ। বিশেষ করে তুমি যখন বুঝতেই পেরেছ, আমি যার বউ, সে খুব সহজ লোক নয়।'

'থাম,' ধমক দিল অলক। 'জ্ঞান দিও না। আমি যা চাই, তা পেতেই অভ্যস্ত আমি। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ঐ ডেঞ্জারাস লোকগুলোকে হটিয়েছি। অযথা খেপিও না আমাকে। মেইন গেটের বাইরে রাস্তার ধারের পোড়ো বাড়িটার মধ্যে বন্দী করে রেখে এসেছি ওদের একজনকে। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, আমি ওদের সাহায্য করি? আমাদের জীপ নিয়ে আশেপাশের বাগানে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। তোমার প্রেমিকপুরুষ নির্ঘাত প্রাণ হারাবে ওদের হাতে। আর তোমার ভাগ্যে কি ঘটবে, বুঝতেই পারছ। আর কিছু না হলেও বিদেশী চরদের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে জেলের ভাত কপালে আছে তোমার।'

বাকশক্তিরহিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আইরিন। অলক আবার তার কাছে সরে এল। থরথর করে শরীর কাঁপছে আইরিনের। সাহস, শক্তি, কোনটাই ফিরে পাচ্ছে না সে। যেন তার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার এত যত্নে বাঁচিয়ে রাখা সুন্দর শরীরটার অপমৃত্যু ঘটবে। ডাঙার বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়ে জলের কুমির দখল করেছে তাকে।

কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শুনতে চেষ্টা করল আইরিন।

দুঃসহ নৈঃশব্দ্য। কেউ আসছে না। মুক্তির কোন উপায় নেই। ভবিষ্যতের দিনগুলোর জন্যে নিজের শরীরটাকে এখন থেকেই দুর্বহ মনে হচ্ছে তার।

সবকিছুর জন্যে সে নিজেই দায়ী। কেন এমন ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে একলা বেরিয়ে পড়েছিল সে? এখন কি করবে? মৃত জীবনটাকে কিভাবে টেনে নিয়ে যাবে সে অনন্ত পথ ধরে? কি করে এই শরীর, এই মুখ তুলে ধরবে সে প্রিয়তমের কাছে? আত্মহত্যা করবে? অত সাহস নেই তার।

চোখ ভেঙে জল নামল। টপটপ করে তার ফোঁটা বালিশে পড়ার শব্দ শুনল সে। আর শুনল একটা পরিচিত, প্রিয় শব্দ। ঠিক পূর্ব মুহূর্তে!

'বাস্টার্ড!' চিলের মত ছোঁ মেরে অলকের পিঠের কাপড় মুঠ করে ধরে তাকে শূন্যে তুলে নিল আরিফ। চাঁদি বরাবর একটা রদ্দা আর কোমর বরাবর কষে লাথি বসাল সে।

ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল অলকের মুখ। ঘাড়ে আবার একটা রদ্দা খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল মেঝেয়। জ্ঞান হারাল।

এত কিছু চোখের সামনে ঘটতে দেখেও আইরিনের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। আরিফ তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার পর সংবিৎ ফিরল তার।

'আমার কিছু হয়নি, আরিফ।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল আইরিন।

'আমি জানি।'

'এখান থেকে নিয়ে চল আমাকে। আমি আর সহ্য করতে

পারছি না।'

'চল।'

ঘর থেকে বেরুবার আগে অলকের বডি সার্চ করে মোটর সাইকেলের চাবি আর পিস্তলটা তুলে নিল আরিফ। দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিল বাইরে থেকে।

'এবার কোথায় যাব আমরা?'

'সিলেট। খবর পেলাম, ওখানে একটা বিদেশী সাহায্য সংস্থার হেলিকপ্টার আছে। চেষ্টা করে দেখতে হবে, ভাড়া পাওয়া যায় কিনা।'

অলকের মোটর সাইকেলে চেপে বসল আরিফ। স্টার্ট দিল। আইরিন পেছনে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকল। আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে মেইন গেটে পৌঁছুল মোটর সাইকেল।

বাধা দিল দারোয়ান।

'স্যার, বাইরে যাবেন না। কি একটা গোলমাল শুরু হয়েছে। কারা নাকি ঢুকে পড়েছে চা-বাগানে।'

'ম্যানেজার সাহেবের অর্ডার আছে। তার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি গেট খোল।'

'উনি তো একটু আগেই একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। আবার ফিরেও এসেছেন।'

'পিছন দিকের পাঁচিল টপকে কয়েকটা লোক ধরে নিয়ে গেছে তাকে।'

'কি সর্বনাশ! আমাদের আর্মড্ গার্ডের লোকজন কি করছে?' গেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল দারোয়ান।

মোটর সাইকেলের গিয়ার বদল করে ধোঁয়া ছেড়ে সাঁ করে বেরিয়ে যেতে যেতে আরিফ বলল, 'জানি না। ডান দিকে খুঁজতে যেতে বল ওদের। আমরা বাম দিকে চললাম।'

বাঁক পার হয়ে মোটর সাইকেল পোড়ো বাড়িটার কাছে পৌঁছোতেই আরিফের পিঠ খামচে ধরল আইরিন।

'শোন! এই বাড়িটা খুব সাবধানে পার হতে হবে।'

আচমকা ব্রেক কষে হেডলাইট অফ করল আরিফ। পোড়ো বাড়িতে ভূতুড়ে নীরবতা।

'কেন?' জানতে চাইল আরিফ।

'অলক বলল, ঐ লোকগুলোর একজনকে সে বেঁধে রেখে গেছে এখানে। বলা যায় না, সে মুক্ত হয়ে ওত পেতে বসে আছে কিনা।' ফিসফিস করে বলল আইরিন।

আরিফ বলল, 'ঠিকই বলেছ। সাবধানে চেক করতে হবে ব্যাপারটা।'

পোড়ো বাড়িটার মধ্যে জটিলতা কিছু নেই। রাস্তার প্রায় ধার ঘেঁষে বাড়িটা। এক ফালি বারান্দা। পিছনে দু'টো ঘর। একটা ঘরের সবটুকু বাইরে থেকে দেখা যায়। সেখানে কিছু নেই। এক হাতে পিস্তল এবং অন্য হাতে আইরিনের কোমর বেস্টন করে ধরে চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল আরিফ। আইরিন বিস্ময়ের সঙ্গে তার সঙ্গীর প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করতে করতে ভাবল, মৌরিদ্বীপের প্রেসিডেন্ট শুধু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানই পড়েননি, ভাল রকমের কম্যাণ্ডো ট্রেনিংও নেয়া আছে তাঁর।

ভাঙা দেয়ালের উইণ্ডোসিলে একজনকে বসে থাকতে দেখা গেল। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। তার মুখে ভয় আর আক্রোশের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু নিশ্চল, নির্বিকার সে। একটা জিনিস মনে হতে ঘাবড়ে গেল আইরিন। কই, লোকটার ধারেকাছে তো দড়ির চিহ্ন নেই! অলক যে বলল, বেঁধে রেখে এসেছে তাকে!

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' চাপা গর্জন করে উঠল আরিফ। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠল ওরা। কি ফন্দী আঁটছে লোকটা? ফাঁদে ফেলেছে নাকি ওদের?

'এই লোকটাই তো তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল!' ফিসফিস করে বলল আইরিন।

আরিফ ধীর পায়ে এগিয়ে পিস্তল তাক করল তার দিকে। পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আইরিনের হাত ধরে টান দিয়ে দৌড়োতে শুরু করল মোটর সাইকেলের দিকে।

'কি হল? এমন করছ কেন? ওকে ওভাবে রেখে চলে আসাটা ঠিক হল?' আইরিন জিজ্ঞেস করল।

'কি করবে ও আমাদের?'

'যদি তাড়া করে?'

'ও বেঁচে নেই, সোনা!'

দশ

স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে তিরতির করে কাঁপছে। আইরিনের মনে হল, ওদের মোটর সাইকেল চলছে না, শুধু গর্জন করছে তীব্র প্রতিজ্ঞায়, আর দু-পাশের ছোট-বড় টিলা, গভীর-অগভীর খাদ আর গাছ-গাছালি প্রচণ্ড গতিতে পেছনে দৌড়োচ্ছে।

'লোকটাকে খুন করেছে অলক?' আরিফের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল আইরিন।

'হুঁ।'

'কেন?'

'ছোকরা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিল। ভালবাসা অংশীদার সহ্য করে না।'

'তুমিও কর না?'

'একটুও না। দরকার হলে ঐ ছোকরাকেও খুন করতাম আমি, যদি আর একটু এগুনোর চেষ্টা করত।'

আবেশে আরিফের পিঠে মাথা রেখে আরও শক্ত করে তাকে

আঁকড়ে ধরল আইরিন। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'সম্ভবত তোমার ভাগীদার তাড়া করছে পিছনে। গাড়ির শব্দ টের পাচ্ছ? বিদঘুটে শব্দের সেই জীপ গাড়িটা। শুনছ?'

মোটর সাইকেলের গতি কমিয়ে শুনতে চেষ্টা করল আরিফ। তারপর আবার গতি বাড়াল।

'সত্যিই, সেই জীপ গাড়িটা।'

'এখন?'

'সাহস হারিও না। উপায় একটা হবেই।'

'জীপ গাড়ির সঙ্গে মোটর সাইকেল পাল্লা দিতে পারে?'

'শুধু তাই নয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক দল মানুষের সঙ্গে জং ধরা পিস্তল নিয়ে একটা লোক পাল্লা দিতে পারে না।'

আইরিন জিজ্ঞেস করতে চাইল, তাহলে?

কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, এ প্রশ্ন অবান্তর। প্রেসিডেন্ট এ. আই. তোকোর উপস্থিতবুদ্ধির ওপর ভরসা করা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ পেল আইরিন।

রাস্তার ডান দিকে গভীর খাদ। বাঁ-দিকে পাহাড়। রাস্তা বেশির ভাগ জায়গায় প্রশস্ত হলেও সৌভাগ্যক্রমে অপরিসর একটা জায়গা পাওয়া গেল। চওড়ায় বিশ ফুটের বেশি হবে না। হঠাৎ ব্রেক করল আরিফ বাঁক পার হয়েই। আড়াআড়িভাবে গাড়িটাকে শুইয়ে রাখল রাস্তার ওপর। আইরিনকে টিলার ওপর ঝোপের আড়ালে লুকোনোর নির্দেশ দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পাঁচ-সাতটা পাথরের চাঁই দিয়ে দশ ফুট জায়গা কভার করার উপযোগী ব্যারিকেড তৈরি করে ফেলল।

তারপর নিজে উঠে এল টিলার ওপর, আইরিনের হাত ধরে বসে পড়ল ঘন ঝোপের আড়ালে।

তীব্র গতিতে ছুটে এল জীপ গাড়িটা। বাঁক পার হয়ে সামনে ব্যারিকেড দেখতে পেল ঠিকই। সমস্ত শক্তিতে ব্রেকও করেছিল, কিন্তু কাজ হল না। চোখ বন্ধ করল আইরিন।

বজ্রপাতের শব্দে ডিগবাজি খেয়ে উলটাল জীপটা, পরবর্তী দু'সেকেণ্ডের মধ্যে গিরিখাদের তলদেশে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

'মোটর সাইকেলটাও শেষ!' আফসোসের সুরে বলল আইরিন।

'হুঁ,' যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে আরিফ বলল, 'বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে আমাদের।'

এয়ারপোর্ট রোডের হোটেল ইউরোপায় পৌঁছল ওরা রাত দশটার দিকে। পুরো পথ হাঁটতে হয়নি। মাইল দুয়েক যাবার পর একটা ঠেলাগাড়ি পেয়েছিল, তাতে চড়ে তিন মাইল, তারপর আরও মাইলখানেক হাঁটার পর শহরমুখো ফিরতি রিকসা পেল একটা। তবু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে আইরিনের।

কাউন্টারের সোফায় গা এলিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। বেলবয় ধীরেসুস্থে উঠে তেতলায় গিয়ে ফ্যামিলি রুমের তালা খুলল। আরও কিছুক্ষণ পর অন্য একজন গিয়ে বিছানায় শীট, পিলো কভার পালটাল। আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল এভাবেই। রিসেপশনিস্ট লোকটা বোধহয় তার সামনে সব সময় লোকজন বসিয়ে রাখতে পছন্দ করে। রুম রেডি করার পরও তার আগ্রহ

হচ্ছে না বোর্ডারদের রুমে পাঠাতে।

দাঁতে দাঁত চেপে এদের কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল আরিফ। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল, 'আগামী দু'চার ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের রুমে গিয়ে রেস্ট নেয়া সম্ভব হবে কি?'

রিসেপশনিস্ট হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠে হাফ ডজন কর্মচারীর উদ্দেশে গালাগালি শুরু করল এবং অবশেষে তাদের রুমে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল। যে লোকটি বিছানা ফিটফাট করল, সে নগদ বিশ টাকা বকশিশ পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কর্মচারী মহলে। এরপর মুহুর্মুহু বেলবয়দের হাজিরা শুরু হল তিনশো বাইশ নম্বর রুমে। 'স্যার, কিছু লাগবে?' 'ম্যাডাম, কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'এত হোটেল থাকতে এই থার্ড ক্লাস হোটেল পছন্দ হল তোমার?' আইরিনের কথাটা যতটুকু না প্রশ্ন, তার চেয়ে বেশি মন্তব্য।

'দু'টো কারণে, ছায়া সঙ্গিনী! প্রথমত, এ হোটেলের প্রত্যেক রুমে ট্রানজিস্টর রেডিও আছে। রেডিও'র বাজনা না শুনলে আমার ভাল লাগে না। দ্বিতীয়ত, এয়ারপোর্ট কাছেই। আবার কখন শত্রুর কবলে পড়ব, তা কি বলা যায়? আজকের ম্যাসাকারের খবর ঘাঁটিতে পৌঁছুলে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।'

আইরিন বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসছে ওর। জড়ান গলায় বলল, ওরা ভয়ও পেতে পারে।'

আরিফ বেল টিপে খাবারের অর্ডার দিয়ে বলল, 'যুক্তি অনুযায়ী ভয় পাবারই কথা। কিন্তু এর উল্টোপিঠেও একটা কথা

আছে। সেটা হল, ভয় পেলে চলবে না তাদের। আমাকে খুন না করা পর্যন্ত ওদের চোখের ঘুম নেই, প্রাণে শান্তি নেই। জানে, কোনক্রমে আমি একবার দেশে ফিরে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারলেই ওদের সমস্ত স্বপ্ন, সাধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওদের অস্তিত্ব। পৃথিবীর অন্তত একটি দেশকে সন্ত্রাসবাদ আর গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত করতে চাই আমি। এটা আমার কমিটমেন্ট।'

'সন্ত্রাসবাদ আর ডান-বাম গোঁড়ামি, এসব থেকে মুক্তির জন্য এই উপমহাদেশে কম চেষ্টা চলছে না। কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে কি?'

'হচ্ছে না। হবে কি করে? আমরা যারা গণতন্ত্রের কথা বলছি, সত্যি সত্যি তারা নিজেরা গণতান্ত্রিক নই। আমরা কি জানি, গণতন্ত্র কত বড় দায়িত্বপূর্ণ দর্শন? আমরা কি বিশ্বাস করি, গণতন্ত্র মানে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের জাগরণ? সহিষ্ণুতা? পারস্পরিক শ্রদ্ধা? জনগণের কাছে নেতার দায়বদ্ধতা? নেতার কাছে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্পণ? আমরা আসলে জানি না, গণতন্ত্র শুধু একটা ব্যবস্থা নয়, একটা প্রকাণ্ড রাষ্ট্রধর্ম। একটা ঐতিহ্য। একটা রুচি। ভাল কথা, বেশ কয়েকদিন বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাইনি। ভালই ঝালিয়ে নিলাম। এবার এস, দু'টো খেয়ে নিই। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোনোর সময় পাব, যদি রাত্রে আর হামলা না হয়। ভোর পাঁচটায় উঠে ঢাকা যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। লোক চলাচল শুরু হবার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আইরিন বিছানার সঙ্গে লাগোয়া দেরাজ থেকে ট্রানজিস্টর রেডিও বের করে অন করল। আমিনা আহমেদের রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে : পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে···

আইরিন সাধারণত গান শোনে না। কিন্তু এই মুহূর্তে গানটা ভাল লেগে গেল। গানের পর জ্যোতি চৌধুরির সেতার। আইরিন খট্ করে বন্ধ করল ট্রানজিস্টর।

বিছানায় শুয়ে কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে নিবিষ্টমনে কি যেন ভাবছিল আরিফ। বলল, 'বন্ধ কর না। এখুনি লেট নাইট নিউজ হবে। তা ছাড়া সেতার খুব টানে আমাকে।'

আইরিন ঘুমিয়ে পড়ল। আরিফ উঠে এসে ট্রানজিস্টর রেডিও সরিয়ে নিল তার কাছ থেকে। আইরিনের ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মুখে আলতো করে চুমু খেল সে। ঘুমন্ত আইরিন ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। চুমুটা যেন অপার্থিব কোন প্রশান্তি এনে দিয়েছে তাকে ঘুমের মধ্যে। তার মুখের রেখাগুলো সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এল আস্তে আস্তে।

খবর শুরু হল। বাংলাদেশের খবরই বেশি। প্রেসিডেন্টের ভাষণের বিবরণ। মন্ত্রীসভায় রদবদল। ট্রাক দুর্ঘটনায় পথচারীর প্রাণহানি। শেষ খবরটা শুনে আনন্দের আতিশয্যে উঠে বসল আরিফ। আহা! কি আনন্দ! নিজের মধ্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না সে।

আইরিনের বিছানার কাছে এগিয়ে গেল আরিফ। খবরটা জানান দরকার তাকে। কিন্তু ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অপরিসীম মমতায় বুক ভরে উঠল আরিফের। কক্সবাজারের

সেই সন্ধ্যা থেকে বেচারির খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। শীর্ণ হয়ে গেছে তার লাবণ্যে উজ্জ্বল মুখ। না, থাক। ঘুমোক বেচারি। ঘুম থেকে উঠে সব খবর জানবে সে।

বাকি রাত জেগে জেগেই কাটল তার। পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা। সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু রদবদল করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রে।

সিলেট বিমানবন্দরে ডিউটিরত অফিসারকে ফাঁকি দেয়া গেল না। সাহায্য সংস্থার বিমান ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিতে এসে তার পাল্লায় পড়ল আরিফ। সে পাইলটের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। একজন পোর্টারকে জিজ্ঞেস করল, 'লজিস্টিক এইডস্-এর বিমানের পাইলট কোথায়, বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি,' অদূরে হ্যাঙ্গারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় একই ধরনের পোশাক পরা যে দু'জন ভদ্রলোক কথা বলছিলেন, তাদের একজনকে দেখিয়ে বলল পোর্টার, 'ঐ লম্বা নতুন ভদ্রলোকই পাইলট।'

এখানেই গোলমাল হয়ে গেল। লম্বা ভদ্রলোক পাইলট নন, তিনি বিমানবন্দরের অন-ডিউটি অফিসার।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ আছে। ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। এদিকে আসবেন কি?'

ভদ্রলোক পাইলটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে টারম্যাকের দিকে হেঁটে এলেন। পথে আরিফ কোন কথা বলল না। লক্ষ্য করল, ভদ্রলোক বার বার তাকাচ্ছেন তার দিকে।

'ইয়ে, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে আমার। হয়ত অন্য পরিবেশে দেখছি বলে বুঝতে পারছি না।' বললেন ভদ্রলোকটি।

'আমার পরিচয় কি আপনার খুবই দরকার ?'

'আয়্যাম সরি,' বিষম বিব্রত দেখাল তাকে। 'আপনার যদি আপত্তি থাকে···কিন্তু···আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে করতে পারব, আশা করি···আপনাকে দেখেছি···ইয়ে···'

'দেখুন, আপনি আননেসেসারিলি···'

হঠাৎ দু'পা এক জায়গায় ঠুকে আনুষ্ঠানিক সালাম দিলেন তাকে ভদ্রলোক।

'স্যার, মহা অন্যায় করে ফেলেছি, মাফ করে দিন। চিনেছি এবার। আপনি···মরিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট···প্রেসিডেন্ট তোকো।'

স্মিত হাসল আরিফ। এর কাছে পরিচয় গোপন করে লাভ নেই। 'চিনলেন কেমন করে ?'

'স্যার, আমি আগে জিয়া-তে ছিলাম। আপনি স্টেট ভিজিটে এসেছিলেন। আমি তখন প্রটোকল ডিউটি করেছি। আপনার চেহারা এত সহজে ভুলে যাব, স্যার ?'

মহা হুলস্থূল বাধালেন অফিসারটি। পোর্টারদেরকে হুকুম দিলেন ভিভিআইপি রুমের তালা খোলার জন্যে।

আরিফ বাধা দিল। 'দেখুন, মিস্টার···'

'আমার নাম শরীফ মোহাম্মদ।'

'মিস্টার শরীফ মোহাম্মদ, আপনি হয়ত জানেন, আমি আত্ম-গোপন করে আছি।'

'জানি, স্যার। এও জানি, আপনার আত্মগোপন করে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঢাকা থেকে টেলেক্স মেসেজ পেয়েছি একটু আগে। আমাদের সরকার অনুমান করেন, আপনি এদিকে কোথাও আছেন। যদি আপনার দেখা পাওয়া যায়, বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকায় পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে আমাদের। বাংলাদেশের সব এয়ারপোর্টকে একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকার আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন।'

সম্মানিত অতিথিকে ভিভিআইপি লাউঞ্জে বসিয়ে শরীফ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি একা, স্যার?'

'না, আমার সঙ্গিনী আছেন একজন। আমি তাকে নিয়ে আসতে চাই।'

'আপনার দেশীয়?'

'না।'

'সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে···' কথা শেষ হল না। ভিভিআই-পি লাউঞ্জের এন্ট্রান্সে ভয়ংকর শব্দে বোমা ফাটল। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। চেয়ালের কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটা ভাঙা কাচের টুকরো আরিফের কানের পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল।

দ্রুত ইমারজেন্সি এক্সিটের দিকে দৌড়ালেন শরীফ মোহাম্মদ। 'এদিকে আসুন, স্যার। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না আপনার।'

সিকিউরিটি অফিসার ছুটে এসে জানালেন, 'একজন ধরা

পড়েছে। স্থানীয় ছেলে। সে কিছুই স্বীকার করছে না। শুধু বলছে, আপনার সঙ্গের ভদ্রলোকটির উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপের জন্যে তাকে ভাড়া করা হয়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বললেন শরীফ মোহাম্মদ। 'আপনি সিকিউরিটি জোরদার করুন। যতক্ষণ এই সম্মানিত অতিথিকে আমরা প্লেনে তুলে না দিচ্ছি, ততক্ষণ যে কোন মূল্যে এইসব তৎপরতার মোকাবেলা করতে হবে। এঁর নিরাপত্তা আমাদের গোটা জাতির প্রেস্টিজ।'

'উনি কোন ফ্লাইটে যাবেন?' সিকিউরিটি অফিসার জানতে চাইলেন।

'নর্মাল ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারি না আমরা। 'লজিস্টিক এইডস্'-এর প্লেনে তুলে দিচ্ছি তাঁকে।'

'আমারও মনে হয় সেটাই ভালো হবে।'

আরিফ বলল, 'আমি কি আমার দায়িত্বে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি না?'

'না, স্যার,' দাঁতে জিভ কেটে বললেন অফিসারটি, 'তা কি করে হয়?'

'তার মানে, আমি বন্দী?' সবিনয়ে জানতে চাইল আরিফ।

ততোধিক বিনয় প্রকাশ করে শরীফ মোহাম্মদ বললেন, 'আপনি, স্যার, প্রোটোকলের হাতে বন্দী।'

বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভাঙল আইরিনের। পুরো শহরটাই যেন কেঁপে উঠেছে। কোথায় কি ঘটল? তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল সে। নিচে লোকজনের জটলা। 'বোমা', 'এয়ারপোর্ট', এইসব শব্দ ভেসে এল ভিড়ের ভেতর থেকে। কৌতূহলী কয়েকজন রাস্তায় নেমে গেছে।

একজনকে বলতে শোনা গেল: 'দুই পার্টির মধ্যে জোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কাল রাত্রে এক দল অন্য দলের জীপ উড়িয়ে দিয়েছে ডিনামাইট মেরে। খাদের নিচে তিনটে লাশ পাওয়া গেছে ভোরবেলা। এখন বোধহয় প্রতিশোধের পালা চলছে।'

অন্য একজন, হতাশার সুরে বলল, 'কি যে হল দেশটার! একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। মানুষ বড় হুযুগপ্রিয় হয়ে উঠেছে!'

হোটেলের প্রবেশপথের পাশেই কলজে কাঁপান শব্দে আর একটা বোমা বিস্ফোরিত হল। মানুষের আর্ত চিৎকার শোনা গেল আর মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা।

আইরিন ক্ষিপ্র গতিতে রুমে ঢুকে পড়ল। ব্যালকনি একটুও নিরাপদ নয়। ইতোমধ্যেই সে অবাঞ্ছিত লোকগুলোর চোখে পড়েছে কি না, কে জানে?

বেশ কিছুক্ষণ আগে আরিফ এয়ারপোর্টে গেছে। যাবার আগে আইরিনের কপালে চুমু খেয়েছে। কপালে তার চুমুর স্পর্শ এখনও অনুভব করতে পারছে সে। বিশ্রী রকমের ভুল করে ফেলেছে, বুঝতে পারল সে। আরিফকে একা যেতে দেয়া উচিত হয়নি। এখন যে কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে। কিন্তু তার কিছুই করার থাকবে না।

ঠিক পনের মিনিটের মধ্যে দরজায় দমাদম ঘা পড়ল। আইরিনের মনে হল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুকু পাথর হয়ে গেছে তার। ঢোক গিলে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'কে?'

ওদিক থেকে জবাব এল, 'আমরা এয়ারপোর্ট অথরিটির লোক। জরুরী দরকার আছে। দরজা খুলুন।'

এয়ারপোর্ট অথরিটি! তাদের কি দরকার ওর কাছে? আরিফের কোন বিপদ হল না কি? অথবা এটা কোন ফাঁদ?

'কার কাছে দরকার?'

'মিস তামান্নার কাছে। প্রেসিডেন্ট তোকোর মেসেজ আছে।'

প্রেসিডেন্ট তোকোর মেসেজ! কি মানে হতে পারে? হয় এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছে আরিফ, অথবা এরা আদৌ এয়ারপোর্টের লোক নয়, টোপ ব্যবহার করছে মাত্র।

'মাফ করবেন। আমি এখন দেখা করতে পারছি না। রিসেপশনে মেসেজ রেখে যান, আমি বলে দিচ্ছি।'

'ও, কে, ম্যাডাম।'

এরপর মেসেজ পড়ে বিষয়টা পরিষ্কার হল আইরিনের কাছে। এরা শত্রু ছিল না। তবু নিজের উপস্থিতবুদ্ধিকে অভিনন্দিত করল সে। আরিফের মেসেজ নিয়ে এসেছিলেন এয়ারপোর্টের ডাকসাইটে অফিসার শরীফ মোহাম্মদ। রুমের দরজা খুলে আইরিন তার মুখোমুখি হওয়া মাত্র একটা সিন ক্রিয়েট হত আর কি। আইরিনকে খুব ভালভাবেই চিনেন তিনি। ঢাকা এবং সিলেট—দুই এয়ারপোর্টেই তার সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ ঘটেছে

আইরিনের। আরিফ সম্ভবত স্বেচ্ছায় পরিচয় দেয়নি। শরীফ মোহাম্মদ চিনে ফেলেছে তাকে। কিন্তু হঠাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হল কেন, এটা বুঝতে পারছে না আইরিন।

ভালই হল। অজ্ঞাতবাসের দিনগুলো শেষ পর্যন্ত তামান্না হকের পরিচয়ে কাটাতে পারল আইরিন। এবার সে আইরিন হয়ে ফিরে যাবে আরিফের কাছে। প্রিয়তম পুরুষটির কাছে ফিরে যাবে নিজের সত্যিকার পরিচয়ে। বুকে ভয় দুলে উঠল। রেগে যাবে না তো লোকটা?

ভাবার সময় নেই। আইরিন উঠে পড়ল। আরিফ এতক্ষণে ঢাকায় পৌঁছে গেছে। যেভাবেই হোক, ফার্স্ট ফ্লাইট ধরতে হবে তাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেল ডিউজ ক্লিয়ার করে বেরিয়ে পড়ল।

বোমাবাজির পর রাস্তা প্রায় জনশূন্য। কিন্তু আইরিনের এখন আর ভয় নেই। নিজেকে হঠাৎ নির্ভার, হালকা মনে হচ্ছে তার।

শরীফ মোহাম্মদ তার চেম্বারে আইরিনকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

'স্লামালেকুম, আপা। আপনি···এখানে···কি ব্যাপার? সিলেটে কবে এসেছেন?'

'বেশ কয়েকদিন। ছুটি কাটালাম আর কি।'

'শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে আপনার।'

'হ্যাঁ। দিনরাত পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরলে যা হয়···'

'শিকার করেছেন নাকি, আপা?'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল আইরিন, 'খুবই কষ্টকর ব্যাপার। মেয়েদের এগুলো সাজে না।'

কোল্ড ড্রিংকস্-এর অর্ডার দিয়ে বিনীত হাসি উপহার দিলেন শরীফ সাহেব। 'বলুন, আপা, আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

'ঢাকায় জরুরী দরকার। ফার্স্ট ফ্লাইটের একটা টিকেট জোগাড় করে দিন, প্লিজ—'

'ফার্স্ট ফ্লাইট? সর্বনাশ! টিকেট তো সব তিন-চার দিন আগেই বুক্ড্ হয়ে যায়। তবু ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার সাহেবকে ধরে দেখি। আপনার কথা বললে একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে।'

এগার

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা দিয়ে আরিফের দিশেহারা হবার অবস্থা। রেড কার্পেট রিসেপশন দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ভিভিআইপি লাউঞ্জে। তুমুল হর্ষধ্বনিতে তাকে বরণ করলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার সদস্যরা।

প্রধান প্রটোকল অফিসার এসে বললেন, 'সাংবাদিকরা অস্থির হয়ে উঠেছেন, স্যার। আপনি কি আমাদের রাষ্ট্রীয় অতিথি-

ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চান?'

'না,' উত্তর দিল আরিফ, 'রিপোর্টাররা আমার সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে যতটা অধীর, তার চেয়ে অনেক বেশি অধীর আমি আমার দেশের মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্যে। রাষ্ট্রীয় অতিথি-ভবনে বিশ্রাম নেবার অফারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। সাংবাদিকদের এখানেই ডাকুন। আমি এখান থেকে সরাসরি দেশে রওনা হতে চাই।'

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ঢাকায় নেই। প্রধানমন্ত্রী বিনবন্দরে এলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। দুই দেশের সম্পর্ক আর সার্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হল।

একটির পর একটি আনুষ্ঠানিকতা। আরিফের কাছে এসব অসহ্য মনে হচ্ছে। ঘন ঘন রানওয়ের দিকে তাকাতে লাগল সে। তামান্নাকে নিয়ে কখন আসবে সিলেটের ফ্লাইট?

ঠিক এই সময় সিলেটের এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের মেসেজ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল আরিফকে।

তিনি জানিয়েছেন, সিলেটের নির্দিষ্ট স্থানে তার সঙ্গিনীকে খবর দেয়া হয়েছে, কিন্তু ফ্লাইট টেক্ অফ্ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি বিমানবন্দরে রিপোর্ট করেননি।

এর মানে কি? কে জানে, শেষ মুহূর্তে কি ঘটল বেচারির ভাগ্যে? অপরাধবোধে জর্জরিত হতে থাকল আরিফ। সাংবাদিক, রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের ফাঁকে ফাঁকে সে যখন দ্রুত চিন্তা করছে কিভাবে তামান্নার খবর নেবে, তখন বাংলাদেশ বিমানের সিলেট ফ্লাইট রানওয়ে স্পর্শ করল।

অসহায়ের মত সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরিফ হঠাৎ দেখল, তামান্না সিঁড়ি দিয়ে নামছে। তার তামান্না! একটুও ভুল দেখছে না সে। কিন্তু ওর রিসেপশনে এত ঘটা কেন, কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না তার। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটিও তাকে সালাম জানালেন। এসব কি ব্যাপার?

আরও বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল আরিফ যখন দেখল, ভিভি-আইপি লাউঞ্জেই আনা হচ্ছে তাকে। আসলে তামান্না কে?

আইরিন তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লাউঞ্জে এল। আরিফের দিকে চোখ পড়তেই চঞ্চল হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল তার দিকে।

ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছ? কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

বিমূঢ় আরিফ উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে বলল, 'তুমি ভাল?'

মানবাধিকার সংস্থার অ্যাডভোকেট মাহবুব বললেন, 'সে কি, মিস চৌধুরী? প্রেসিডেন্ট তোকোর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে দেখছি!'

'মিস চৌধুরী!' স্বগতোক্তি করল আরিফ। তামান্নার পারিবারিক পদবী তাহলে চৌধুরী?

এই সময় আইরিনকে অবাক করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল তিথি।

'আপা! কি অবস্থা হয়েছে আপনার! কোন খবরই দিলেন না আমাদের। শাহ আলম সাহেব আর আমি কোথায় না খুঁজেছি! খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন আমাদের।'

'আইরিন, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়,' বলল শাহ আলম, 'সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আইরিন! আইরিন চৌধুরী! এসব কি ব্যাপার?' আরিফ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করল। 'বাংলাদেশের রিচেস্ট লেডি আইরিন চৌধুরীর কথা বলছেন আপনারা?'

'আমরা তাঁর 'কথা' বলছি না, তাঁকে 'নিতে' এসেছি।' বিরক্তিমাখা স্বরে বলল শাহ আলম।

আইরিন নিজেও ভেবে পাচ্ছে না, কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে। 'আরিফ, প্লিজ, সব তোমাকে পরে বলব। আমি তামান্না নই।'

তিথি ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। আইরিন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমরা কোত্থেকে খবর পেলে, আমি এখন এখানে আসব?'

লাজুক হেসে তিথি বলল, 'এয়ারপোর্টের অফিসারদের আপনার ছদ্মনাম জানিয়ে রেখেছিলাম। কোন খবর পেলেই আমাদের জানানোর কথা তাদের। আজ একজন জানালেন, প্রেসিডেন্ট তোকোর সফরসঙ্গী হিসেবে সিলেট থেকে তাঁর এখানে আসার কথা। প্রথমে এসে যখন খবর পেলাম, তিনি অনিবার্য কারণে আসতে পারেননি, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'ইয়েলো ডিয়ারের' ডিরেকটর এবং অন্য কর্মকর্তারা একে একে এসে দেখা করতে লাগলেন। অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদেরও দেখা গেল।

প্রটোকল অফিসার এসে আরিফকে জানালেন, তাঁকে স্বদেশে

নিয়ে যাবার জন্যে বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইট রেডি।

আইরিন হঠাৎ ঘোষণা করল, সে ঐ বিমানে মরিল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যাচ্ছে। তিথি আর শাহ আলম থ'হয়ে গেল।

শাহ আলম কিছু একটা বলতে গেল আইরিনকে। কিন্তু তিথি বাধা দিল তাকে। সে সব বুঝে নিয়েছে।

'আমি কিছুদিন পর কয়েকদিনের জন্যে বাংলাদেশে ফিরব। সব বোঝাপড়া তখন হবে। আপাতত আমার কয়েকটি নির্দেশ আছে, সেগুলো তিথির কাছে রেখে যাচ্ছি।'

তিথি ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করল। শাহ আলম বোকার মত একবার আরিফ, একবার আইরিন আর একবার তিথির দিকে তাকাতে লাগল।

নিচে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ-এর লুটোপুটি, কাছে-দূরে মেঘের রহস্য। বাংলাদেশ বিমানের ছোট্ট ডাকোটা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মূল ভূ-ভাগ থেকে বহুদূরে সমুদ্রবেষ্টিত শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে। পাইলটের পিছনের কেবিনে পাশা-পাশি দু'টো আসনের একটিতে আশা আর স্বপ্নে উচ্ছল একজন মানুষ—তিন লাখ মানবতাবাদী মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামের নেতা। আর পাশে তাঁর ভাবী স্ত্রী। বিচিত্র অনুভূতি তার হৃদয়ে।

চোখ ছলছল করে উঠল আইরিনের। আরিফ সযত্নে তার চোখ মুছিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'দেশের জন্যে মন খারাপ করছে?'

আইরিন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না, আমি তো আমার দেশেই যাচ্ছি। যখন খবর পেলাম, তোমার লিবারেশন আর্মির কাছে ষড়যন্ত্রকারীরা পরাজিত হয়েছে, সারা দেশে আনন্দ-উৎসব, আর তোমার প্রতীক্ষায় বিমানবন্দরে হাজার হাজার লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে, তখন মনে হল, এ বিজয় তো আমারও। তোমার হাত ধরে আমার নতুন দেশের মাটিতে নামব আমি, উৎসবে যোগ দেব। তোমার অভিষেক দেখব।'

'শুধু দেখবে?' আইরিনের গালে চুমু খেয়ে বলল আরিফ।

'তা কেন? আমার দর্শন তো তোমাকে বলেছি। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত 'শুভ' আমার, একটি 'অশুভ'ও আমার নয়। নতুন দেশে সেই 'শুভ'-র লালন আর, অশুভে'র বিনাশের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ভালবাসার বন্ধনে ক্রমে বেঁধে ফেলব একটি মানবগোষ্ঠীকে, একটি দেশকে। দেশের সীমানা অতিক্রম করে আমাদের ভালবাসা বন্ধন গড়ে তুলবে মহাদেশ জুড়ে।'

বঙ্গোপসাগরের উচ্ছ্বাসে আইরিনকে বুকে জড়িয়ে ধরল আরিফ।

—ঃ শেষ ঃ—